দেশ-বিদেশ ভ্রমণ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
ও
লেডী অবলা বসু

ভ্রমণ শারদীয়া ১৪২১ সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

দেশ-বিদেশ ভ্রমণ

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
ও
লেডী অবলা বসু

ভ্রমণ শারদীয়া ১৪২১ সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

ভূমিকা

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যুগান্তকারী তত্ত্বপ্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর দেশভ্রমণের কথা বোধহয় খুব অল্পজনেরই জানা।

চিরস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র সে যুগে বর্তমান ভারতের কয়েকটি সুপরিচিত জায়গার ভ্রমণকথা লিখে গিয়েছেন। তার মধ্যে কাশ্মীর ভ্রমণ নানা বৈশিষ্ট্যে আজও আমাদের মনোহরণ করে।

এটাও আজ ইতিহাস যে জগদীশচন্দ্র ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়েছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে পাওয়া তত্ত্ব পাশ্চাত্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সেই বিদেশ ভ্রমণকথা বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে এক উজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত বলে আমাদের মনে হয়। আমাদের ভ্রমণসাহিত্যের ইতিহাস যদি সত্যিই কোনওদিন নিষ্ঠা ভরে লেখা হয় সেখানে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসুর এই দেশ-বিদেশ ভ্রমণকথা নিশ্চয় উপযুক্ত মর্যাদায় উল্লেখিত হবে।

জগদীশচন্দ্রের সাগরপারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে তাঁর সুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লেখার আংশিক পুনরুদ্ধার 'ভ্রমণ' পত্রিকার পাঠককে বিস্ময়ে ও আনন্দে মুগ্ধ করবে— এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাংশের শিরোনাম আমাদের দেওয়া।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসুর 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থ থেকে নেওয়া এই ভ্রমণকথা সংকলনের নামকরণও আমাদের। রচনার ক্রমও দুয়েকটি ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যস্ত করেছি। তবে, পুনর্মুদ্রণে আমরা বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন প্রকাশিত 'রচনাবলী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রবন্ধাবলী' অনুসরণ করেছি। এই প্রামাণ্য পাঠ ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। এই সুযোগে বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের সকলকেই আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মূল 'প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটি যাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় পাওয়া গিয়েছিল সেই ডঃ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
প্রধান সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মাননীয় মহাশয়,
বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন (বিজ্ঞান ভারতী-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-এর সদস্যদের কাছে এটি একটি আনন্দ সংবাদ যে, বি. বি. মিশন প্রকাশিত 'রচনাবলী' গ্রন্থটি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আপনি এই পুস্তকটির মধ্যে থেকে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লেডী অবলা বসু-র লিখিত তাঁদের ভ্রমণকাহিনি পুনর্মুদ্রণে আগ্রহী হয়েছেন। আপনাদের এই প্রয়াসকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং তথ্যসূত্র হিসেবে আপনি যে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকটিকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মূল পুস্তকটি 'প্রবন্ধাবলী' এই নামে ১৩৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়; সম্ভবত দ্বিতীয় কোনও সংস্করণ এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি।

পরিশেষে আবার জানাই, এই পুস্তকটির কিছু অংশ 'ভ্রমণ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হবে জেনে আমরা সবিশেষ আনন্দিত।

বিনীত
পতাকীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন

সমুদ্রপারের উদ্যোগে আচার্যের পাথেয় সংকট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল— কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— ''যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং'', ''এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।'' সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণসম্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্র-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তাঁর সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্ম্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, ‘‘জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।’’ আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে।

প্রথম প্রকাশ: *‘প্রবাসী’ পৌষ, ১৩৪৪*

সূচিপত্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

লেডী অবলা বসু

কাশ্মীর

এবার পূজার ছুটিতে আমরা কাশ্মীর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কাশ্মীর ভারতের কোন্‌দিক তাহা ভারতের ম্যাপে দেখ। তোমাদের মধ্যে যাহারা ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভালবাস, তাহাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য আমাদের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে ভালবাসে; তাহার সুফল এই হয় যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা নূতন দেশ আবিষ্কারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। উত্তর মেরুদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য স্যার জন ফ্রাঙ্কলিনের মত কত লোক অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন। আফ্রিকার নানা স্থান আবিষ্কারের জন্য লিভিংষ্টোন সাহেব কত শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কতবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এখনও[১] ন্যানসেন নামক এক জন সাহেব গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে কি আছে তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাদের এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এতটা না হইলেও আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকের মনে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিবার আগ্রহ জন্মিবে।

পূর্ব্বে কাশ্মীর সম্বন্ধে অনেক পুস্তকে অনেক বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, শুনিতাম কাশ্মীর নাকি ভূতলে নন্দনকানন। আমার এই সকল কথা অতিরঞ্জিত বলিয়া

---

১. ইহা ১৩০২ সালের বিবরণ, এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 'মেরুপ্রদেশ' শীর্ষক পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

বোধ হইত। হিমালয়ের অনেক দর্শনীয় স্থান ইহার পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। কুমায়ুনের তুষার নদী দেখিতে গিয়া প্রকৃতির যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, তাহার অধিক সৌন্দর্য্য যে আর কোথাও আছে তাহা বিশ্বাস হইত না।

রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে যাইতে হয়, তাহার পর টোঙ্গা গাড়ীতে চড়িতে হয়। তোমাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমে থাক, তাহারা অবশ্যই এই গাড়ী দেখিয়াছ। তিন দিন এই টোঙ্গায় চড়িয়া কত পাহাড় পর্ব্বত ও উপত্যকা পার হইলাম। প্রায় ৫ মাইল অন্তর টোঙ্গার ঘোড়া একবার করিয়া বদলান হয়। এই সকল স্থানে পথিকদের জন্য ধর্ম্মশালা ও খাবার জিনিষের দোকান আছে। এই সকল স্থানে ১০/১৫টা গরুর গাড়ীর গরুগুলিকে বিশ্রাম করিতে করিতে রোমন্থন করিতে দেখা যায়। এই নিরীহ পশুগুলি কিরূপে এই সকল গাড়ী ও অসমান পার্ব্বত্য রাস্তা দিয়া এত ভারী বোঝা লইয়া যায়, তাহা ভাবিলে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। সকাল বেলা ৭/৮টা হইতে ইহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিতে থাকে, দুপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিয়া আবার ৩/৪টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করে। গরুর গাড়ী ছাড়া পথে মধ্যে মধ্যে উটের সারি চলিতেছে দেখা যায়। পাঠানেরা ২/৩ পরিবার হইয়া চলে। উটের পিঠে সমুদয় বোঝা চাপাইয়া দেয়। পথশ্রমে ক্লান্ত স্ত্রীলোকেরা মাঝে মাঝে উটের উপরে চড়িয়া যায়। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে ইহারা এক এক স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস, পাতা ও কাপড় দিয়া তাঁবু প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করে এবং উটগুলি চারিদিকে চরিয়া বেড়ায়। টোঙ্গা গাড়ীগুলি যেন রাস্তার মালিক; টোঙ্গার বাঁশী বাজিবামাত্র এই উটের সারি, গরুর গাড়ী বা এক্কা সকলেই পথ ছাড়িয়া এক পাশে গিয়া দাঁড়ায়। টোঙ্গা চলিয়া গেলে পুনরায় মন্থর গমনে চলিতে থাকে। আমরা সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে বিশ্রামের জন্য কোন ডাক বাঙ্গালায় আশ্রয় লইতাম। পরদিন আহারাদির পর আবার যাত্রা করিতাম। পথে যে রমণীয় দৃশ্য দেখিতাম তাহাতে পথের সকল কষ্ট দূর হইত। এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাইতে বিচিত্র দৃশ্য দেখিতাম। কোথাও উচ্চ পর্ব্বতের চূড়াগুলি আকাশ ভেদ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র বেষ্টিত

উপত্যকা রহিয়াছে। নদী কোথাও গভীর গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে, আবার কোথাও শান্তভাবে বহিয়া যাইতেছে। এই রাস্তার প্রত্যেক সুন্দর স্থানের বর্ণনার স্থান হইবে না। পথে পুরাতন শিখদের দুর্গ, কত ভগ্ন মন্দির, কত সুন্দর বৃক্ষ দেখিলাম। অবশেষে আমরা ঝিলাম বা বিতস্তা নদীতে নৌকার আশ্রয় লইলাম। সে নৌকা একটা দেখিবার মত জিনিস, উহাকে ইংরাজীতে House boat বা গৃহ-নৌকা বলে; ইহাতে ৪/৫ কুঠুরি। তাহাতে খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি সকল আবশ্যকীয় জিনিস আছে। আবার শীত নিবারণের জন্য আগুন জ্বালিবার স্থান ও ধোঁয়া বাহির হইবার জন্য চিমনী আছে। আমরা বৃষ্টি বা শীত পড়িলে চিমনীতে আগুন জ্বালিয়া তাহার চারদিকে বসিয়া গল্প করিতাম বা পুস্তকাদি পাঠ করিতাম। এখন এই গ্রীষ্মের মধ্যে সে সকল বিষয় লিখিতে লিখিতে স্বপ্নরাজ্যের কথা বলিয়া মনে হয়। এই নৌকাগুলি যেমন নূতন রকমের, ইহাদের চলাইবার ধরনও সেইরূপ। স্রোতের বিপরীত দিকে যাইবার সময় মাঝিরা গুণ টানিয়া লইয়া যায়। স্রোতের দিকে যাইবার সময় বেশীর ভাগ স্রোতেই ভাসাইয়া লয়। কখনও কখনও লগি দিয়া চলায়। এই লগি চালানকে তাহারা বল্লম লাগান বলে। বড় বড় নৌকাতে প্রায়ই দাঁড় ব্যবহার করে না। নৌকার ভিতরে থাকিয়া নৌকা চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারা যায় না। মাঝিরা সন্ধ্যা হইলে আর নৌকা চালায় না। মাঝিরা পরিবার লইয়া নৌকাতেই থাকে এবং স্ত্রী পুরুষ এমনকি ৫/৬ বৎসরের শিশুরাও নৌকা চালাইতে সাহায্য করে। আমরা নৌকাতে উঠিয়া দ্বিতীয় দিনে উলার নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ পার হইলাম। এই হ্রদটি মাঝিরা খুব ভোর রাত্রিতে পার হইতে আরম্ভ করে এবং বড় নৌকায় পার হইতে ৬/৭ ঘণ্টা লাগে। মাঝিরা বিকাল বেলা কোন ক্রমেই এই হ্রদ পার হইতে চায় না, বিকাল বেলা এখানে প্রায়ই ঝড় হয় এবং বড় ঝড় হইলে বড় বড় ঢেউ উঠিতে থাকে। একবার নাকি একজন মুসলমান নবাব মাঝিদের নিষেধ না শুনিয়া বিকাল বেলাই হ্রদ পার হইতে চেষ্টা করিয়া কিছুদূর গিয়াই ঝড়ে পড়িয়া বহুসংখ্যক অনুচরসহ জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

কাশ্মীরী মাঝিরা ঝড়কে বড় ভয় করে; একদিন একটু সামান্য বাতাস

হওয়াতে বিতস্তা নদীতে অল্প অল্প ঢেউ উঠিতেছিল। মাঝিরা তখনই চীৎকার করিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা বাঁধিয়া ফেলিল এবং সেদিন আর নৌকা চালাইল না। ইহাদের এত ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কারণ, নদীটী শরৎকালে এমন ছোট যে, এপারে বসিয়াও ওপারের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়, এবং তাহাতে এত অল্প জল যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। তবে সকল স্থানে জল সমান নয় বলিয়া বোধ হয় কেহ হাঁটিয়া পার হইতে চেষ্টা করে না।

আমরা উলার হ্রদ পার হইয়া, পুনরায় বিতস্তা নদীতে পড়িলাম; যতক্ষণ এই হ্রদের মধ্যে ছিলাম, ততক্ষণ মনে হইতেছিল যেন, আমরা সমুদ্র-বক্ষে আছি; বহুদূরে পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছিল, আমরা সমুদ্রের ন্যায় অকূল জলরাশির মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এখনও সেই প্রকাণ্ড হ্রদ ও দূরবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গের দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

বিতস্তা নদীতে আসিয়াই, মাঝিরা চা খাইবার জন্য বক্‌সিস চাহিল; হ্রদ পার হইতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয় বলিয়া এবং নির্ব্বিঘ্নে হ্রদ পার হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই বোধ হয় এই প্রথা চলিত হইয়াছে।

নদীর দুই পারেই সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং অনেক দূরে মাঝে মাঝে কৃষকদিগের কুটীর। এক একটা ক্ষেত্রের পর দূর হইতে বৃক্ষশ্রেণী দেখিলে, বুঝিতাম কৃষকপল্লী নিকটেই। এই ক্ষুদ্র প্রশান্ত নদীর তীরস্থিত কৃষকের গ্রামগুলি দেখিলে নূতন দেশে নূতন শান্তিময় রাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া মনে হইত।

নদীর দুই ধারে পাহাড়ের সারি। ইহাকে পীর পাঞ্জল শ্রেণী কহে। পাহাড়গুলি চিরবরফে ঢাকা রহিয়াছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু মেঘের জন্য সকল দিন তাহা দেখিবার সুবিধা ঘটে না। দার্জ্জিলিং থাকিতে যেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখিতে পাইতাম, সেদিন কত আনন্দ হইত। কাশ্মীরে দিবানিশি এই বরফে আচ্ছন্ন শৃঙ্গগুলি দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে দিগন্তব্যাপী বরফের স্তূপ। এই বরফ রাশিতে সূর্য্যকিরণ পড়িলে এক নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। কখন সোনালী রঙ্গে, কখন উজ্জ্বল রৌপ্য বর্ণে, আবার কখন বা গোলাপী আভাতে ঝক্ ঝক্ করিতে

থাকে।

পরদিন আমরা সম্বল নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। দূর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেনার গাছ দেখিয়া বুঝিলাম গ্রাম নিকটেই। চেনার গাছগুলি অনেকটা অশ্বত্থগাছের মত; তাহা হইতেও অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। কাশ্মীর ভিন্ন আর কোথাও এই গাছ জন্মে না। এখানে ইহাকে বৃক্ষরাজ (Royal tree) বলে। রাজার আদেশ ভিন্ন কেহ ইহার ডাল ভাঙ্গিতে পারে না। সম্বলে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা পর দিন প্রত্যূষে মানসবল নামক একটি হ্রদ দেখিতে গেলাম। এই হ্রদে প্রবেশ করিবার পথ বড় সঙ্কীর্ণ। আমাদের নৌকা বড় বলিয়া আমরা হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। পাহাড়ের উপরের কয়েকটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র পার হইয়া মানসবলে পৌঁছিলাম। হ্রদের পারে অল্প জলের মধ্যে অনেকগুলি দেশীয় ক্ষুদ্র ঘোড়া হাঁসের মত জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া ডুবাইয়া কি খাইতেছে দেখিয়া আমাদের বড় হাসি পাইল। পরে জানিলাম ইহারা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ খাইতেছে। মানসবলের তট দিয়া হাঁটিয়া গিয়া আমরা ফকীরের গুহাতে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট এই গুহার কথা শুনিয়া অবধি ইহা দেখিবার খুব ইচ্ছা ছিল। মহর্ষি যখন কাশ্মীরে বেড়াইতে যান, তখন এই সাধু জীবিত ছিলেন এবং প্রত্যহ এক কোদালী মাটি কাটিয়া নিজের সমাধি প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরা গিয়া শুনিলাম যে, দুই বৎসর হইল সাধুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে গুহাতে কবরস্থ না করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সমাধির উপরে পেয়ারা, আপেল, পিচ প্রভৃতি নানাবিধ গাছ রোপিত হওয়াতে স্থানটী অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছে। আমরা আলোক লইয়া গহ্বরটি দেখিলাম। গুহাটি ২০/২৫ হাত লম্বা। আসিবার সময় সাধুর পুত্র আমাদিগকে অনেক ফল উপহার দিলেন। জেলে ডিঙ্গির মত ছোট নৌকায় আমরা মানসবল ত্যাগ করিয়া গৃহ-নৌকাতে ফিরিলাম। হ্রদের জল এত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, হ্রদের তলস্থিত সবুজবর্ণ শেওলাগুলি পর্য্যন্তও স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই হ্রদের মধ্যে স্থানে স্থানে পদ্মবন। যখন পদ্মগুলি ফুটে তখন না জানি হ্রদের শোভা আরও কত বৃদ্ধি পায়। হ্রদের এক পার্শ্বে নুরজাহানের প্রমোদ কাননের ভগ্নাবশেষ

দেখিলাম; কাশ্মীরের মধ্যে যে যে স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত, সেই সেই স্থানে নুরজাহান প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও শ্রীনগরে সেই সকল গৃহ সুরক্ষিত আছে।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে সাদিপুর নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে সিন্ধু নামে ক্ষুদ্র নদী বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। মিলনের মধ্যস্থলে জলের মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপে একটি চেনার বৃক্ষ রোপিত আছে। দুই নদীর সঙ্গম-স্থল বলিয়া এস্থান কাশ্মীরবাসীদিগের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। তাঁহারা এখানে স্নান ও পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। সন্ধ্যার সময় নৌকার ছাতে বসিয়া সুদূরে বহুগৃহ সমাকীর্ণ নগর দেখিতে পাইলাম; বুঝিলাম, উহাই শ্রীনগর। শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। কাশ্মীরের মহারাজ গ্রীষ্মকালে এখানে এবং শীতকালে জম্মুতে বাস করেন। শ্রীনগর সহরটি বিতস্তা নদীর দুই পারে তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণতঃ নৌকাতেই উভয় পারে যাতায়াত সম্পন্ন হয়; উভয় পারে অসংখ্য নৌকা। গাড়ীর পরিবর্ত্তে শ্রীনগরে নৌকাই ব্যবহৃত হয়। উভয় পারে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সাতটি সেতু আছে বটে, কিন্তু নৌকার প্রচলনই অধিক। এক একটি ধনীর নৌকা দেখিবার মত জিনিষ। নানাবর্ণে চিত্রিত ও কারুকার্য্যে মণ্ডিত নৌকার মধ্যে কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা বেশভূষা করিয়া বিচিত্র আসনে বসিয়া আছেন, এবং ২০/২৫ জন মাঝি তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া বিদ্যুৎবেগে শত শত নৌকার মধ্য দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, দেখিতে খুব সুন্দর।

আমাদের নৌকা শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া মাত্র ব্যবসায়ীরা নৌকা করিয়া তামা, রূপা ও কাগজের বাসনপত্র ও কাশ্মীরী শাল লইয়া আমাদিগের নৌকার চারিদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকাতে বসিয়াই আমরা কাশ্মীরের সমুদয় শিল্পদ্রব্য দেখিলাম।

শ্রীনগরের যেদিকে ইংরাজেরা বাস করেন, সে দিকটা খুব পরিষ্কার; চেনার, সফেদা প্রভৃতি গাছ সারি সারি থাকাতে সেই স্থানের খুব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। স্থানটির নাম মুন্সীবাগ। শ্রীনগরের নিকটে তাঁবু ফেলিয়া অনেক সাহেব বাস করেন, তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য মহারাজা সুন্দর সুন্দর স্থান

নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা পরদিন ডাল হ্রদ দেখিতে গেলাম। ইহা একটি প্রকাণ্ড হ্রদ, বিতস্তা নদী হইতে ডাল হ্রদে যাইবার জন্য খাল কাটান আছে। অনেকে ডাল হ্রদে বেড়াইতে যান; ইহা শ্রীনগরের একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। এই হ্রদের পারে সালিমার বাগ, নসিম বাগ, নিসাত বাগ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর প্রাচীন উদ্যান রহিয়াছে। সালিমার বাগ নুরজাহানের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হ্রদ হইতে সালিমার বাগে প্রবেশ করিবার জল-প্রণালীর দুই পার্শ্বে সারি সারি উইলো গাছ জলে নুইয়া পড়িয়াছে। সেস্থান দিয়া আমাদের ছোট নৌকা সালিমার বাগে প্রবেশ করিল। লাহোরের সালিমার বাগের আদর্শে এই উদ্যান নির্ম্মিত হয়। সেইরূপ সিঁড়ির ধাপের মতন সাতটা ধাপে এই বাগান নির্ম্মিত! প্রমোদ গৃহের চারি পার্শ্বে ফোয়ারার জল পড়িবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বের মতনই রহিয়াছে। গৃহে বসিয়াই হ্রদের সৌন্দর্য্য এবং অদূরে বরফের শোভা সম্ভোগ করা যায়। আমরাও এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে পুরাতনকালের কথা স্মরণ করিয়া সালিমারের শিল্পচাতুর্য্যের এবং নুরজাহানের রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। আর একদিকে পরিমহল নামে মুসলমানদের সময়ের একটি মান-মন্দির আছে। তাহার নিকটে চসমাসহি নামে বিখ্যাত নির্ঝরিণী। পূর্ব্বে এই নির্ঝরিণীর জল কেবল শ্রীনগরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পান করিতেন; এখন এই জল নল দিয়া শ্রীনগর সহরে লওয়া হইয়াছে, এবং সকলেই তাহা পান করিতে পারে।

ডাল হ্রদের আর একদিকে একটি গ্রামে হাজরত বাল্ নামে একটি মসজিদ আছে। এখানে মহম্মদের মাথার চুল রক্ষিত আছে বলিয়া প্রবাদ আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। ডালহ্রদে প্রবেশ করিতেই ডানদিকে 'টাখ্‌ত সলিমিন' নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহার শিখরে একটি পুরাতন মন্দির আছে; কেহ কেহ বলেন এই মন্দিরটি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; এজন্য ইহার আর এক নাম শঙ্করাচার্য্য। এই পাহাড়ে উঠিলে শ্রীনগর সহরটি পরিষ্কার দেখা যায়। ডালহ্রদ হইতে আর একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে যাওয়া যায়; তাহার নাম হরি পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের উপর মহারাজার দুর্গ— তাঁহার অস্ত্র-

শস্ত্রও এখানে রক্ষিত হয়। ডালহ্রদের মধ্যেও অনেক পদ্মবন; কয়েকদিন হইল ফুল ফুটিয়া গিয়াছে মনে হইল। ফুলের বোঁটাগুলি তখনও পাতার মধ্যে খাড়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া এই হ্রদে ভাসমান ক্ষেত্র (Floating gardens) এক অপূর্ব্ব জিনিস; পানা ও শেওলার উপর মাটি ফেলিয়া এই বাগান প্রস্তুত করা হইয়াছে; ইহাতে তরমুজ, ফুটি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি তরকারী প্রস্তুত হয়; মালী ইচ্ছামত এই ক্ষেত্র হ্রদের যেস্থানে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারে। এই হ্রদটি এত বড় যে, একদিনে ইহার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা যায় না। শ্রীনগর হইতে আমরা ইসলামাবাদে গেলাম। পথে অবন্তীপুর ও পান্ডর্ত্তন নামক দুই স্থানে প্রাচীন মন্দির দেখিতে নামিয়াছিলাম। ইসলামাবাদ কাশ্মীরের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান; ঝিলাম নদী এখান হইতেই বড় হইয়াছে; ইহার পর আর নৌকাতে যাওয়া যায় না। আমরা ইসলামাবাদ হইতে ডাণ্ডিতে ভাওয়ান, মার্ত্তণ্ড, আচ্ছাবল, ভেরীনাগ প্রভৃতি স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। ভাওয়ান ইসলামাবাদের অতি নিকটে; এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। এখানে একটি প্রস্রবণের জল বাঁধাইয়া তাহাতে অনেক মাছ রাখা হইয়াছে; অমরনাথ যাত্রীরা এই রাস্তাতে যান এবং এখানে বিশ্রাম করেন। যাত্রীদের জন্য প্রস্রবণের পাশে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচ হইতে ক্রমাগত জল বাহির হইতেছে দেখা যায়।

পথে মার্ত্তণ্ড নামে একটি পুরাতন মন্দির দেখিলাম। ইহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের পূজার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে; এই মন্দির দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাশ্মীর দেশ সমগ্রই এককালে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল; চতুর্দ্দিকে জলের মধ্যে উচ্চতম শিখরে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আচ্ছাবল ও ভেরীনাগ, এই দুই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়; এই দুই স্থানেও নুরজাহানের প্রমোদ-গৃহ আছে। আমাদের সময় বেশী না থাকাতে এখান হইতেই আমাদের ফিরিতে হইল, নতুবা কাশ্মীরে দর্শনীয় আরও অনেক স্থান আছে। যদি আবার কখনও যাইবার সুবিধা হয়, তবে সেই সব স্থানের বিষয় তোমাদিগকে জানাইব।

লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ

অযোধ্যার নাম কে না জানে? রামায়ণ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের মনে অযোধ্যার নাম জন্মের মত গাঁথিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন অযোধ্যা বা আউধ্ প্রদেশে অযোধ্যা নামে একটি পুরাতন নগর পড়িয়া আছে। সেটি হিন্দুদের একটি তীর্থ স্থান। সেখানে গেলে সেখানকার পাণ্ডারা রামসীতার অনেক চিহ্ন দেখায়। বলে, ঐখানে শ্রীরামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, এই ঘরে সীতাদেবী রন্ধন করিতেন ইত্যাদি। সে সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, যে অযোধ্যা নগরের নাম হইতে অযোধ্যা প্রদেশের নাম হইয়াছে, অনেকদিন হইল সে অযোধ্যা নগর নিবিয়া গিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্তে লক্ষ্ণৌ নগর জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই লক্ষ্ণৌ নগরের বিষয় কিছু বলিতেছি। লক্ষ্ণৌ সহর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। গোমতী গঙ্গারই শাখা; খালের মত সহরটির একপাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া, এই স্থানের শাসনভার লক্ষ্মণের উপর দেন, লক্ষ্মণের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম লক্ষ্মণপুর হয়, পরে তাহা হইতে লক্ষ্ণৌ হয়। হিন্দু রাজাদের সময়ে লক্ষ্ণৌ তত বিখ্যাত ছিল না, মুসলমান রাজাদের রাজত্ব সময়েই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে অযোধ্যা তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল। পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হইলে, বাহাদুর শাহ নাম-মাত্র দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। ইঁহারই সময়ে সদৎ আলী খাঁ নামক একজন পারস্য-দেশীয় বণিক সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া, অযোধ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর

পর ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। অনেক রক্তপাতের পর মহম্মদ শাহ্ নামে এক ব্যক্তি সম্রাট হন। এই সময়ে সদৎ আলী খাঁ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনভাবে নবাব উপাধি গ্রহণ করিয়া, অযোধ্যাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই অযোধ্যার প্রথম নবাব। সদৎ আলী খাঁর বংশের লোকেরা ইংরাজদিগের অধিকার সময় পর্য্যন্ত একশত বৎসর নিরুপদ্রবে অযোধ্যায় রাজত্ব করেন। ক্রমে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ বাধিয়া ইংরাজেরা প্রসিদ্ধ বক্সারের যুদ্ধে লক্ষ্ণৌএর তখনকার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন। বলিতে গেলে সেই সময় হইতেই ইংরাজেরা অযোধ্যার রাজকার্য্যে হাত দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও দিল্লীর সহিত অযোধ্যার নামমাত্র সম্বন্ধ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই সম্বন্ধ ঘুচাইয়া ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবকে আপনাদের করদ রাজারূপে পরিণত করেন। অবশেষে নবাবেরা করপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে এবং অন্যান্য কারণে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব ওয়াজেদ আলী খাঁ লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং অযোধ্যাকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের রাজ্যভুক্ত করা হয়। ওয়াজেদ আলী খাঁ অত্যন্ত সৌখিন ও সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌঠুংরি নামে এক বিখ্যাত নূতন সুরের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইংরাজেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার নিকট মেটিয়াবুরুজে বন্দী করিয়া রাখেন। সে সময়ে তাঁহার প্রজারা শোক করিয়া নিম্নলিখিত গানটি বাঁধিয়া ছিল।

'নিমক হারামে মুলুক ডুবায়া,
হজরত প্রাযে হে লণ্ডন কো।
ওয়াজদালসী যুগ যুগ জীয়ে,
যিস্‌নে বনায়ি লক্ষ্ণৌ নগরী।
মহলমে মহলমে বেগম রোয়ে,
গলি গলি রোয়ে পাথুরিয়া।'

ওয়াজেদ আলী খাঁ মৃত্যু পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বাস করিতেন। বন্দী অবস্থায়ও তাঁহার আড়ম্বরপ্রিয়তা বা সখের হ্রাস হয় নাই। প্রকাণ্ড অট্টালিকার উপরে পায়রাদিগের বাসস্থান নির্ম্মিত ছিল। পায়রার খেলা দেখিতে ওয়াজেদ আলী খাঁ বড় ভালবাসিতেন। হাজার হাজার পায়রা ঝাঁকে

ঝাঁকে নবাবের অট্টালিকার উপরে উড়িত। তাঁহার সুন্দর উদ্যানটিও একটি দেখিবার স্থান ছিল। তখনও আলীপুরের পশুশালা হয় নাই। নবাবের বাগানের জন্তু সংখ্যা আলীপুরের পশুশালা হইতে সংখ্যায় অল্প হইলেও সেখানে হাঁস ও অন্যান্য পাখীর সংখ্যা অনেক অধিক ও নানা প্রকারের ছিল। লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের বাড়ী, ঘর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার আদিস্থান লক্ষ্ণৌ দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে মনে ছিল। লক্ষ্ণৌএর বাগান, রাজবাড়ী, প্রভৃতি সমুদয়ই নবাবদের বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়। লক্ষ্ণৌ সহরে অনেকগুলি উদ্যান আছে; তাহার মধ্যে কাইসারবাগ নামক উদ্যানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ওয়াজেদ আলী খাঁ এই উদ্যানটিকে ইন্দ্রভবন তুল্য করিয়া তাহাতে বাস করিতেন। এখন আর ইহার তেমন শোভা নাই। পূর্ব্বে যেখানে বেগমদিগের বাসস্থান ছিল এখন তাহা সৈনিকদের জেল হইয়াছে ও উদ্যানের মধ্যে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌএর পুরাতন রাজভবন 'ছত্রমঞ্জিলে' এখন সরকারী কাছারী হয়।

'মচ্ছিবাওয়ান' ও 'ইমামবাড়া' লক্ষ্ণৌএর দুইটি প্রধান দেখিবার উপযুক্ত স্থান। 'মচ্ছিবাওয়ান' একটি মস্‌জিদ। প্রবাদ এই যে, এখানে লক্ষ্মণের বাসস্থান ছিল বলিয়া, হিন্দুরা ইহাকে পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করিতেন, এজন্য হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব এখানে এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে ৫২টী মাছের ছবি আছে বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এখানে একটি কূপ আছে তাহা প্রায় দ্বিতল গৃহের সমান উচ্চ। 'ইমামবাড়া' আসফ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহার পিতা সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 'রুমীদরজা' নামক প্রকাণ্ড ফটক কনষ্টান্টিনোপল নগরের প্রকাণ্ড ফটকের অনুকরণে নির্ম্মিত। ইহার নিকটে হোসেনাবাদ নামক একটি মসজিদ। আদিল শা নামে এক নবাব ছিলেন, তিনি নিজ সমাধির জন্য এই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এখানে নৃত্য গীতাদি আমোদ হইত। উপরে বেগমদিগের বসিবার জন্য সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। এত বড় প্রকাণ্ড গৃহ আমরা আর দেখি নাই। আমাদের কলিকাতা টাউন হল হইতেও অনেক বড়। এখন ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়া বড় দুঃখ

হইল। লা মার্টিনিয়ার কলেজের গৃহ লক্ষৌএর আর একটি দর্শনীয় স্থান। মার্টিনিয়ার সাহেব নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নবাবের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। প্রথমে এই অট্টালিকা নবাবের ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে ইহাতে মার্টিনিয়ার সাহেবের সমাধি হয়। মার্টিনিয়ারের সমাধির উপরে ছয়তলা গৃহ দুর্গের ন্যায় উঠিয়াছে, দুই পার্শ্বে কলেজ গৃহ। অট্টালিকাটি ইটালিয়ান ধরনে নির্ম্মিত।

এই সকল অট্টালিকা ব্যতীত সিপাহীবিদ্রোহের ভগ্নাবশেষ বেলিগার্ড বা পুরাতন রেসিডেন্সী একটি দর্শনীয় স্থান। এই স্থানটী একটি উচ্চ ভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে স্যার হেন্‌রী লরেন্স সাহেব লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্যার হেন্‌রী লরেন্সের নাম এদেশে বিখ্যাত। তিনি যেমন বীর, তেমনিই কর্ত্তব্যপরায়ণ ও তেমনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। বেলিগার্ডের ভগ্ন গৃহগুলি ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইতেছে। কামানের গোলা যেখানে যেখানে লাগিয়াছিল, সেখানে সেখানে বড় বড় ছিদ্র আজিও রহিয়াছে। যে গৃহে কামানের গোলা লাগিয়া লরেন্সের মৃত্যু হইয়াছিল, যেখানে অস্ত্রশস্ত্র রাখা হইয়াছিল, যেখানে আহতদিগের জন্য হাসপাতাল হইয়াছিল, সে সকল স্থান দেখিলাম। মৃত্তিকার নিম্নে একটি ঘরে শিশু ও রমণীদিগকে রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সেখানেও কামানের গোলা প্রবেশ করিয়া কয়েকজনকে বিনষ্ট করে। সেই ঘরে এখনও স্থানে স্থানে রক্তের দাগ দেখা যায়। ইহার নিকটেই যুদ্ধে হত বীরগণের সমাধি স্থান। নীল্, আউটরাম প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। ইংরাজদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া স্যার হেন্‌রী লরেন্সের প্রাণ যায়। তাঁহার সমাধির উপরে শুদ্ধ এই কথা লিখিত আছে: ‘ইনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।’’ এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে গভীর বিষাদের আবির্ভাব হইল, আমরা বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

চিতোর দর্শন

এদেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে সর্ব্বত্রই একটা ক্লেশ হয়। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় স্থানেই দেখা যায়, মুসলমান রাজারা হিন্দুদের প্রাচীন কীর্ত্তিসকল লোপ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কাশীতে গেলে দেখিবে পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া একজন মুসলমান রাজা সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এইরূপে কোথাও বা হিন্দুদের দেব মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই প্রস্তর দিয়া মস্‌জিদ হইয়াছে, অথবা মুসলমান রাজাদের গোরস্থান হইয়াছে; কোথাও বা সেই প্রস্তর দিয়া সহরের দরজা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুজ্‌রাটের রাজধানী আমেদাবাদ সহরে একবার দেখা গেল যে একটি রাস্তার যে পাথরখানি তোলা যায়, তাহাই এক একটি হিন্দুদের দেবমূর্ত্তি। কোনও মুসলমান রাজা পাথর উল্টাইয়া দেবমূর্ত্তিগুলি নীচের দিকে রাখিয়া এই রাস্তাটী বাঁধাইয়া ছিলেন। এইরূপ সর্ব্বত্রই হিন্দু কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া প্রাণে এক প্রকার ক্লেশ হয়; এবং বর্ত্তমান রাজারা যে কত ভাল তাহা বারবার মনে হয়। তাঁহারা কেমন যত্ন করিয়া হিন্দুর ও মুসলমানদিগের প্রাচীন কীর্ত্তিসকল রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ যত স্থান দেখিয়া আমাদের মনে ক্লেশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে চিতোর সর্ব্বপ্রধান। চিতোর দেখিয়া আমরা চক্ষের জল রাখিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতে যে চিতোরবাসী রাজপুতদিগের বীরত্বের কথা শুনিয়া আসিতেছি, যে চিতোরের গুণকাহিনী কতই পড়িয়াছি, যে চিতোরের নাম যেন কর্ণে লাগিয়াই রহিয়াছে, সেই চিতোর যখন দেখিলাম, তখন চক্ষের জল ফেলিয়া বলিলাম, "হায় রে, এই কি সেই চিতোর!" বোধ হইল যেন কোনও ঘুমের দেশে আসিলাম! যেন পাহাড়-পর্ব্বত, বাড়ী-ঘর,

গাছ-পালা, মানুষ-পশু সকলেই ঘুমাইতেছে, সকলেই যেন মরিয়া আছে।

তোমরা মধ্য ভারতবর্ষের ম্যাপে চিতোর নগর দেখ। সমুদয় নগরটি একটি পাহাড়ের উপরে দুর্গের দ্বারা বেষ্টিত। এই দুর্গে বাস করিয়া রাজপুত বীরগণ দিল্লীর সম্রাটদিগকেও কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে সব অদ্ভুত কথা এখানে বলিবার অবসর নাই। তোমাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু অধিক, টড্ সাহেবের প্রণীত 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থের অনুবাদ পাইলে, তাহাতে চিতোরের রাজপুতদিগের বীরত্বের বিবরণ পড়িয়া দেখিও।

চিতোরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সুরম্য রাজপুরী বিদ্যমান; উদ্যানে বৃক্ষসকল ফলফুলে ভরিয়া রহিয়াছে, রাজপুরীর সম্মুখে সুন্দর দেবমন্দির, তাহার গায়ে বিচিত্র শিল্পকার্য, মধ্যে মহাদেবের মূর্ত্তি; সন্নিকটে একটি সুন্দর জলাশয়; তাহার পার্শ্বে প্রকাণ্ড আম্র-কানন স্থানটিকে ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সকলই মৃত। রাজবাড়ী, দেবমন্দির, আম্রকানন সমুদয় জনশূন্য। নগরে রাস্তা-ঘাট গৃহাদি সমুদয়ই বর্ত্তমান, কিন্তু জনপ্রাণীর দেখা নাই; যেন কে মরণ-কাটি ছোঁয়াইয়া সহরটিকে মারিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যহীন হইলেও রাজপুত বীরপুরুষ ও রমণীদিগের কীর্ত্তি চিতোরকে জাগ্রত রাখিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্থানে এত বীরকীর্ত্তি একত্রিত দেখা যায় না।

চিতোর-দুর্গে উঠিবার পূর্ব্বে চিতোরের পাহাড়ের নিম্নে একটি প্রকাণ্ড মাঠ পার হইয়া যাইতে হয়। এই মাঠেই মুসলমান রাজারা তাঁবু গাড়িয়া চিতোর অবরোধ করিতেন। এখনও এই মাঠে যুদ্ধে হত মুসলমান সৈনিকদিগের সমাধিসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। চিতোর নগর ৫০০ ফিট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর স্থিত। উপরে উঠিবার একটি ভিন্ন পথ নাই; এই জন্যই মুসলমান রাজারা এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ সহজে অধিকার করিতে পারিতেন না।

রাজপুতানার অন্তর্গত মেবারের সূর্য্যবংশীয় রাণারা চিতোরকে তাঁহাদের প্রধান গৌরবস্থল মনে করিতেন। চিতোর শত্রু-হস্তে পড়িলে যতদিন তাহা পুনরায় অধিকার করিতে না পারিতেন ততদিন গভীর দুঃখ ও ক্লেশে কালযাপন করিতেন। রাণা প্রতাপসিংহ চিতোর হারাইয়া কিরূপ দুঃখে কালযাপন করিতেন, তাহার বিবরণ তোমরা হয়ত পাঠ করিয়াছ। প্রতাপসিংহ যে কঠিন

প্রতিজ্ঞা করিয়া পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিতেন, এবং স্বর্ণপাত্রের পরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্রে আহার করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ আজিও সেই নিয়মের অনুকরণ করিয়া বিছানার নীচে একগাছি তৃণ এবং স্বর্ণ থালার নীচে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন— একথাটাও তোমরা জান।

আমরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজপ্রাসাদগুলি দেখিলাম। যে হ্রদের সম্মুখে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রাসাদ, সে হ্রদ এখন শুষ্কপ্রায়; হ্রদের মধ্যে পদ্মিনীর বিশ্রামভবন, তাহার চতুর্দ্দিকে এখনও অল্প অল্প জল আছে। এই পদ্মিনীর উপাখ্যান হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। তাহা এই— দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে হরণ করিবার উদ্দেশে প্রথম চিতোর অবরোধ করেন। অনেকবার অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করেন। এই ভীষণ সমরে রাণা লক্ষণসিংহ বংশরক্ষার নিমিত্ত একমাত্র পুত্র রাখিয়া এগারটি পুত্রের সহিত রণে প্রাণদান করেন। দুর্গের পূর্ব্বদিকে কুম্ভ রাণা ও রাণা সংগ্রামসিংহের প্রাসাদ; ইহা যে নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্যে শোভিত ছিল তাহা এখনও বোঝা যায়।

রাণা সংগ্রামসিংহের সহিত বাবরের যুদ্ধ হয়। বাবর কয়েক বার যুদ্ধে পরাজিত হন, কিন্তু শেষে রাণা সঙ্গের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় জয়লাভ করেন।

নগরের মধ্যস্থলে রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ এখনও আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাণা কুম্ভ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে মালব দেশের রাজা মহম্মদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। এই নবতল স্তম্ভটি ১২০ ফিট উচ্চ; এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে দশ বৎসর লাগিয়াছিল। স্তম্ভের গাত্রে বহুবিধ সুন্দর প্রস্তর খোদিত রহিয়াছে। কুম্ভ রাণার পত্নী মীরাবাই এর নাম এদেশে বিখ্যাত। মীরা অতিশয় ভক্তিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া চিতোরে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় দ্বারকাপুরী দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার জন্য এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়; এরূপ প্রবাদ প্রচলিত থাকাতে, কেহ কেহ ইহাকে মীরাবাই এর স্তম্ভও বলিয়া থাকেন।

আমরা চিতোরের বহুবিধ পুরাতন মন্দির প্রভৃতি দেখিয়া অবশেষে এমন

এক স্থানে উপস্থিত হইলাম, যেখানে আসিয়া আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলাম না। এই স্থানে পর্ব্বতের গাত্রে এক ক্ষুদ্র মন্দির। পর্ব্বতের গাত্র হইতে নিরন্তর স্ফটিকধারা সমান জলধারা বহির্গত হইয়া মন্দিরস্থিত মহাদেবের মস্তকে পড়িতেছে। এই প্রস্রবণের জল দ্বারা সম্মুখের একটি বাঁধান পুষ্করিণী সর্ব্বদা পূর্ণ হইতেছে। ইহার দক্ষিণে একটি সুরঙ্গপথ দেখিলাম। রাজবাটী হইতে সুরঙ্গটি আসিয়াছে। চিতোরের স্বাধীনতার দিনে রাজকন্যাগণ এই পথ দিয়া এখানে আসিয়া পূজা ও স্নান সমাপন করিতেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়া ছিল, তাহা এই:— ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবর অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। দুর্গস্থ রাজপুতগণ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণ দিয়া দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। একদিকে যেমন মুসলমানগণ বার বার দুর্গ প্রাচীর ভগ্ন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে রাজপুতেরাও রাত্রের মধ্যেই তাহা পুনরায় সংস্কার করিয়া লইতে লাগিলেন। বহুকাল এইরূপ চলিল। পরিশেষে যখন রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ জয়মল্ল ও পুত্ত আকবর কর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তখন নেতাশূন্য হইয়া আর অধিককাল দুর্গ রক্ষা করিতে পারা যাইবে না জানিয়া, দুর্গস্থিত সমস্ত নরনারী শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। তখন আট হাজার রাজপুত বীর হরিদ্রাবর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া জন্মের মত আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রদলের ন্যায় শত্রু সৈন্য মধ্যে পতিত হইলেন, ও অসামান্য বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজপুত নারীগণ দলবদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া একজন বাঙ্গালী কবি যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা হইতে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।[১]

'জ্বল, জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা,
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন, জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোনরে যবন, শোনরে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকে উল্লেখিত একটি মূল কবিতা থেকে জগদীশচন্দ্র এই উদ্ধৃতাংশটি নিয়েছেন।

সাক্ষী হ'লেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।
"জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ, অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ,
জ্বলুক জ্বলুক, চিতার আগুন, পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্‌রে যবন, দেখ্‌রে তোরা, কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি,
জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই, তবু না হইব তোদের দাসী।"
দেখ্‌রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন, দেখ্‌রে চন্দ্রমা, দেখ্‌রে গগন,
স্বর্গ হতে সব দেখ দেবগণ, জলদ-অক্ষরে রাখগো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও দেখ্‌রে, সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন, সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে।

আমরা যে মন্দিরের নিকট বসিয়াছিলাম তাহার সম্মুখেই এই মহা চিতাস্থান। এই দারুণ ঘটনার পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আকবর শাহ্ যখন চিতোরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজপুত বীরগণের বীরত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ মোহিত হইল। তিনি দেখিলেন, চিতোরে বাধা দিতে আর কেহ নাই। পুরুষেরা সকলে রণক্ষেত্রে মরিয়াছে ও রমণীরা চিতানলে দগ্ধ হইয়াছে। শুনা যায়, এই ঘটনাতে আকবরের প্রাণে এত ক্লেশ হইয়াছিল, যে, তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া জয়মল্লের ও পুত্তের প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি গড়াইয়া নিজের প্রাসাদ সমীপে স্থাপন করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ[১] ভ্রমণ

ম্যাপে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, বঙ্গ দেশ হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কত দূরে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ প্রায় সমুদয়ই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, তিন দিকে সমুদ্র, উত্তরে দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ; এই সীমার অন্তর্গত দেশগুলিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কহে। প্রধান নগর মাদ্রাজ সহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মাদ্রাজে যাইবার দুইটি পথ আছে, স্থলপথে যাইতে হইলে, হাওড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া পুনা পর্য্যন্ত যাইয়া, সেখান হইতে পুনরায় রেল গাড়ীতে মাদ্রাজ যাইতে হয়। ইহাতে পথকষ্ট অধিক, এবং যাইতে প্রায় ছয় দিন লাগে। সমুদ্রপথে বিশেষ কোন কষ্ট নাই, কলিকাতায় জাহাজে উঠিয়া চারিদিনের দিন মাদ্রাজে পৌঁছান যায়। যাঁহাদের পূর্ব্বে সমুদ্র দেখা হয় নাই, তাঁহারা এই সুযোগে সুমদ্র দেখিয়া লইতে পারেন। বাল্যকালে সমুদ্রের বর্ণনা পড়িয়া ও শুনিয়া সমুদ্র দেখিবার ইচ্ছা আমার মনে খুব প্রবল ছিল। সুতরাং সমুদ্রপথেই মাদ্রাজ যাত্রা করিলাম।

জাহাজ চড়িয়া ক্রমে যখন সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখনকার আনন্দ বর্ণনা করিতে পারি না। নদীর জল যেখানে সমুদ্রের গাঢ় নীল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে স্থানে স্পষ্ট দুইটি বিভিন্ন জলস্রোত দেখা যায়,—একদিকে নদীর কর্দ্দমময় জল, অপর দিকে সমুদ্রের পরিষ্কার গাঢ় নীল জল। গঙ্গাসাগর ছাড়াইলেই জাহাজের লোকেদের তীরের সহিত শেষ দেখা,—তার পরই অকূল সমুদ্র! পার নাই, কিনারা নাই—যেদিকে চাই কেবল তরঙ্গময় জলরাশি! ঝড় না থাকিলে সমুদ্রযাত্রা বড় সুখকর। রাত্রিতে সমুদ্রের যাত্রা বড় সুখকর।

১. তখনকার মান্দ্রাজ পরে মাদ্রাজ নামে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রবন্ধের মধ্যে মাদ্রাজ কথাটি ব্যবহৃত হইল।

রাত্রিতে সমুদ্রের জলে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা যাইত! জাহাজের সংঘর্ষণে জলে যেন শত শত আলো জ্বলিয়া উঠিত। সমুদ্রে একপ্রকার জীবাণু আছে, তাহারা জাহাজের আঘাতে জোনাকীর ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। তিন দিন, দিনরাত্রি চলিয়া রাত্রিতে জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছিল। রাত্রিতে বন্দরে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই, এজন্য বন্দরের বাহিরে নঙ্গর ফেলিয়া রহিল। আমরা সেই রাত্রেই কেবিনের গবাক্ষ দিয়া মাদ্রাজের আলোকস্তম্ভ দেখিলাম। মাদ্রাজ উপকূলস্থ জলমগ্ন বালুকা দ্বীপের উপর পতিত হইয়া অনেক জাহাজ বিনষ্ট হয় বলিয়া এই আলোকস্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। পরদিন প্রাতে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল, আমরা তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠিয়া দেখিলাম, নূতন দেশে আসিয়াছি। ক্ষুদ্র নৌকার সারি পিপীলিকার ন্যায় জাহাজখানিকে ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকাগুলি নূতন ধরনের, লোকগুলির চেহারাও বেশ নূতন ধরনের। ছবিতে ইহাদের বেশ ও নৌকার আকৃতি দেখিতে পাইবে। যে নৌকাগুলিতে ৮/১০ জন মাঝি দেখিতেছ, সেগুলি আরোহীদের জন্য, আর পাশাপাশি তিন চারিটা তালগাছ বাঁধা ছোট ছোট নৌকাগুলি জাহাজে খাদ্যাদি আনিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষুদ্র নৌকাতে চড়িয়াই জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়, এই নৌকার নাম 'কাটামারান'। কিরূপে এই কাটামারানে চড়িয়া জেলেরা দিনরাত্রি সমুদ্রে কাটায় ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। অভ্যাসবশতঃ ইহাদের মনে কোন ভয় নাই। আর এ নৌকার ডুবিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, নৌকাগুলি ভাসিবেই। আমি অনেকবার লোকজনসহ নৌকা উল্টাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

আমরা একখানা বড় নৌকা করিয়া তীরে পৌঁছিলাম, এখন বন্দর নির্ম্মিত হওয়াতে তীরে উঠা সহজ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে অত সহজ ছিল না। এক একবার ঢেউ আসিয়া নৌকা ঠেলিয়া তীরে না লইয়া গেলে, মাঝিদের সাধ্য নাই যে, নৌকা তীরে লইয়া যায়। তাহার পরেও মাঝিদের কাঁধে চড়িয়া শুষ্ক স্থানে নামিতে হয়। এখনও যাহারা বন্দরের টেক্স দিতে না চান, তাঁহারা ঐ প্রণালীতে তীরে উঠিতে পারেন। তীরে উঠিয়া প্রথমেই মাদ্রাজীদের ভাষা কানে ঠেকিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে চারিটি ভাষা প্রচলিত; উত্তর-পূর্ব্ব দিকে

‘তেলেগু’ ভাষা, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ‘তামিল’ ভাষা, উত্তর-পশ্চিমে ‘কেনেরিস’ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ‘মালায়ালাম।’ এই সকল ভাষাকে দ্রাবিড়ী ভাষা বলে। নিজ মাদ্রাজে তামিল ভাষা ব্যবহৃত হয়। কেনেরিস ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাগুলি আমাদের কানে বড় কর্কশ বোধ হয়। ইহাদের ভাষা না জানিলেও বিদেশীদের কলিকাতায় আসিলে যেমন অসুবিধা হয়, মাদ্রাজে তেমন হয় না, কারণ সকলেই প্রায় কাজ চালান ধরনের একটু একটু ইংরাজী জানে।

তীরে উঠিয়া প্রথম দৃশ্য, মাদ্রাজের দুর্গ ‘ফোর্ট সেন্ট জর্জ্জ’। ছবিতে এই দুর্গ ও দুর্গের মধ্যস্থিত নিশান স্তম্ভ দেখিতে পাইবে।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। প্রথম যখন ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার জন্য রত্নগিরির রাজার নিকট হইতে সামান্য ভূমিখণ্ড গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের আত্মরক্ষার সামান্য উপায় ছিল মাত্র। মহারাষ্ট্রীগণ যখন দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠিল, তখন (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) তাহারা মাদ্রাজস্থ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন, তাহার পর ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা একবার মাদ্রাজ অধিকার করেন। পরে ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ভাবিলে অবাক হইতে হয়, একটি ক্ষুদ্র সহর হইতে এখন কত বড় একটা প্রেসিডেন্সী গঠিত হইয়াছে! সমুদ্র তীরে দুই মাইল জুড়িয়া সেনে হাউস, হাইকোর্ট, হোটেল, গভর্ণমেণ্ট হাউস, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকা সকল শোভা পাইতেছে। সহরে উঠিয়া দুর্গ ছাড়াইলেই ‘ব্ল্যাকটাউন’[২] বা কাল সহর। এখানে সহরের যত দোকান পাট; অনেকটা কলিকাতার চাঁদনী এবং বড় বাজারের ন্যায়। এই স্থানে অনেক মাদ্রাজী ও ফিরিঙ্গী বাস করে। সহরের এই অংশকে কেন এই কুৎসিত নাম দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে এক একটি ইংরাজ পল্লী— আবার এক একটি গ্রাম ও শস্য ক্ষেত্র— এইরূপ ২৭ বর্গ মাইল স্থানে সহরটি বিস্তৃত। সহরের মধ্যদিয়া ‘কুয়াম’ নামে

২. এখন ইহা ‘জর্জটাউন’ নামে অভিহিত।

খালের ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছে; সহরের মধ্যে যাতায়াত করিতে হইলে অনেকবার নদীর উপরস্থ সেতু পার হইতে হয়।

সহরের মধ্যে দেখিবার স্থান 'পিপ্‌ল্‌স পার্ক' বা জনসাধারণের উদ্যান, মিউজিয়াম এবং বোটানিকেল গার্ডেন, তাহাও কলিকাতার তুলনায় বেশী কিছু নহে। যাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তাঁহারা সহরের ধূলা ও রৌদ্র ভোগ করিয়া মাদ্রাজের যথেষ্ট নিন্দা করেন, কিন্তু যাঁহারা অধিক দিন মাদ্রাজে থাকিয়া মাদ্রাজের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য শোভা এবং অপরাহ্নে সমুদ্রতীরের শোভা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মাদ্রাজ তত খারাপ বোধ হয় না। সমুদ্রতীরে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ন্যায় বাদ্যস্থান আছে; এখানে অপরাহ্নে সহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বেড়াইতে আসেন। সমুদ্রতীরে বালুকারাশির মধ্যে নামিয়া শামুক কুড়ান একটা প্রধান আমোদ। মাদ্রাজের মিউজিয়ামে নানা রকমের বিচিত্র শামুক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বিভক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে শামুক কুড়ান এক নেশা হইয়া দাঁড়ায়। অনেক ইংরাজ বালক বালিকা এমন কি বড় বড় লোক এই প্রকারে আমোদ লাভ করেন।

মাদ্রাজে স্কুল কলেজের সংখ্যা কলিকাতার ন্যায় এত অধিক না হইলেও কতকগুলি ভাল ভাল কলেজ আছে। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিলার সাহেবের খৃষ্টান কলেজ, সরকারি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জনসাধারণের 'পাচিয়াপা' কলেজই প্রধান। 'পাচিয়াপা' নামে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক কলেজ নির্ম্মাণার্থ ও কলেজের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কলেজের সংলগ্ন সাধারণের বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য 'পাচিয়াপার হল' নামে একটি হল আছে। মাদ্রাজীদের আচার ব্যবহার ও খাদ্য বাঙ্গালীদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জাতি বিচারের কঠিন নিয়মগুলি এখনও রক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এই তিন বর্ণ ব্যতীত 'পারিয়া' নামে আর এক নীচ জাতি আছে, তাহারা আমাদের দেশের মুচি হইতেও ঘৃণার পাত্র। এই জাতি এখন দলে দলে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজেদের উন্নতি সাধন করিতেছে।

সাধারণতঃ মাদ্রাজীরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করে না; হয় শূন্য পদে, না হয় কটকী জুতার ন্যায় চটি পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়। পুরুষেরাও স্ত্রী

লোকদের ন্যায় লম্বা চুল রাখে, কানে অলঙ্কার পরে, কাহারও কাহারও হাতে বালাও দেখিয়াছি। পুরুষেরা যখন স্নানান্তে অনাবৃত পদে কোট পেণ্টলুন পরিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যান তখন সেই দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখায়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বঙ্গদেশের ন্যায় স্ত্রীলোকদের অবরোধ প্রথা নাই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যান না বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রীলোকদের আবশ্যক মত বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে কফি খাওয়ার নেশা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। সমস্ত দিন ইঁহাদের বাড়ীতে হাঁড়িতে কফি প্রস্তুত থাকে; নিজেরাও বার বার কফি পান করেনই, অতিথি অভ্যাগত আসিলেই তাঁহাদেরও কফি পান করিতে অনুরোধ করেন।

বিস্তৃত সহর বলিয়া রাস্তাতে লোকজনের কোলাহল বা গাড়ী ঘোড়ার শব্দ অধিক শুনা যায় না। আমি যখন মাদ্রাজে ছিলাম, তখন রাস্তাতে গ্যাসের আলো ছিল; আজকাল শুনিয়াছি, ইলেক্ট্রিসিটি দ্বারা ট্রামগাড়ী চালিত হয়; ইহা সত্ত্বেও বাহ্য উন্নতিতে মাদ্রাজ যে বোম্বাই ও কলিকাতা অপেক্ষা হীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাদ্রাজ বিষুবরেখার নিকট বলিয়া এখানে শীত গ্রীষ্মের বৈষম্য নাই। শীত তো একেবারেই নাই, সমস্ত বৎসর ধরিয়া একই রকম গ্রীষ্ম। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মুসলমানদের প্রভাব বেশী না থাকাতে হিন্দুকীর্ত্তি সমুদয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যেমন প্রতি সহরে মুসলমানদের নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদি দেখা যায়, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তেমনি হিন্দুদের দেবালয় প্রভৃতির কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। বারান্তরে তোমাদিগকে সেই সব স্থানের কথা জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের মুকুলে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লুপ্ত নগরী

ইটালীর দক্ষিণ প্রদেশ অতি রমণীয়, সমস্ত প্রদেশটি যেন একটি উদ্যান। এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সচরাচর দেখা যায় না।

রোমানরা এই প্রদেশে সমুদ্রের উপকূলে সমৃদ্ধিশালী নগর নির্ম্মাণ করিয়া অবকাশের সময় সেস্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতে আগমন করিত। এই সব নগরের মধ্যে হেরাক্লিয়াম এবং পম্পেই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

ভিসুভিয়স্ পর্ব্বত ইহাদের অতি সন্নিহিত; এই পর্ব্বত হইতে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, লোকে এরূপ আশঙ্কা করে নাই। তাহারা নির্ভয়ে তাহার চারিপার্শ্বে সুন্দর ফুলফল-পূর্ণ বাগান ও সুশোভন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন ভিসুভিয়স্ অগ্নিবৃষ্টি করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে এই দুইটি নগরী পৃথিবী হইতে মুছিয়া লইল!

৭৯ খৃঃ অব্দে ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রথম ভূমিকম্প হইতে আরম্ভ হয়, ভূমিকম্প সাধারণ ঘটনা বলিয়া অধিবাসীরা কিছু মনে করে নাই, পূর্ব্ববৎ সব কার্য্যই চলিতে লাগিল।

রাত্রে নাট্যশালাতে গীতবাদ্য হইতেছে,—অতি প্রকাণ্ড আম্পিথিয়েটারে সিংহ ও মানুষে লড়াই হইবে, দর্শকে আমোদ-ভবন পূর্ণ, সকলেই আমোদে মত্ত! এমন সময়ে অকস্মাৎ ভিসুভিয়সের শিখর হইতে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আকাশ অগ্নিময় হইয়া গেল। বজ্রধ্বনিতে পৃথিবী পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতে লাগিল! ভিসুভিয়াসের গহ্বর হইতে অগণ্য জ্বলন্ত প্রস্তর চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তারপর উত্তপ্ত কর্দ্দমবৃষ্টি, তারপর ভস্মবৃষ্টি!

নগরবাসীরা হঠাৎ বজ্রধ্বনি ও অগ্নিপাতে ভীত হইয়া যে যেখানে পারিল

পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কোথায় পুত্র, কোথায় কন্যা, কোথায় স্ত্রী, সকলে ভীতস্বরে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বাহিরে অন্ধকার, তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া রাস্তায় বাহির হইল, কিন্তু হায়! যে আলোকের সাহায্যে তাহারা পলায়ন করিবে ভাবিয়াছিল, সে আলোক ভস্মপাতে নিবিয়া গেল। তখন লোক-স্রোতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা পথ ভুলিয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবল যখন ভিসুভিয়সের অগ্নিশিখায় মুহূর্ত্তের জন্য দিক আলোকিত হইতেছিল, তখন সকলে পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছিল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল, যাহাদের লইয়া একত্রে বাহির হইয়াছিল, তাহারা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কাতর আহ্বানে কেহ আর প্রিয়জনের উত্তর পাইল না।

ক্রমে লোকেরা ক্লান্ত ও হতাশ্বাস হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল— তখনও ভস্মপতনের বিরাম নাই। স্তরে স্তরে ভস্মস্তূপ উন্নত হইয়া পলাতকদিগের আপাদমস্তক প্রোথিত করিল।

পলাতকদের ত এই ভীষণ পরিণাম! কেবল কয়েকজন পলায়ন করিতে চেষ্টা করে নাই,— নগরের রোমান প্রহরীরা নগররক্ষাতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিবার আদেশ পায় নাই। সুতরাং স্বস্থানে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান রহিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পর তাহাদের প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল দেহ পাওয়া গিয়াছে।

শত শত বৎসর পূর্ব্বে এই নগর দুইটির চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। খনন করিতে করিতে দৈবাৎ প্রোথিত গৃহের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। তখন হইতে ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট নিয়মিতরূপে খনন করিয়া ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপ পরিষ্কার করিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্বের নগর এখন মনুষ্যগোচর হইয়াছে।

নেপল্‌স্ হইতে আমরা পম্পেই দেখিতে যাই, কি আশ্চর্য! দুই সহস্র বৎসর ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তবু মনে হয় না, ইহা এত পুরাতন।

এই যে রাস্তা দিয়া চলিতেছি এই রাস্তায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের গাড়ীর চাকার দাগ স্পষ্ট রহিয়াছে। বৃষ্টি হইলে রাস্তায় জল জমিত, জুতা যাহাতে না

ভিজিয়া যাইতে পারে, সেজন্য রাস্তার মাঝে পাথর বসান ছিল, এখনও সেই পাথরগুলি যথাস্থানে রহিয়াছে, রাস্তার পাশ দিয়া জলের পাইপের নলগুলি এখনও দেখা যাইতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি, ভস্মচাপে অনেকে জীবন্তই সমাহিত হইয়াছিল। তাহাদের দেহ ভস্মে আবৃত হইয়া এতকাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত ছিল। একটি গৃহে অনেকগুলি মৃতদেহ দেখিলাম। তাহা দেখিয়া সেই দুর্দ্দিনের ঘটনা যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। এই যে পুরুষটির ছবি দেখিতেছ, সে একান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, হাত তুলিয়া ভস্মপাত হইতে নিজে রক্ষা করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিল। তাহার নিকটেই একটি কুকুর যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

নগরের এক স্থানে দেখিলাম, রন্ধন-গৃহ হইতে পাচক বাহির হইতে পারে নাই, সে সেস্থানেই রহিয়াছে— উনানে রন্ধনের বস্তু রহিয়াছে, কেবল একটু পুড়িয়া গিয়াছে। রুটিখানি পর্য্যন্ত যেমন তেমনি রহিয়াছে। অন্যস্থানে একটি স্ত্রীলোক হস্তে অলঙ্কারের বাক্স লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ছাদ চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। স্কুলের ছাত্র সঙ্গীদিগকে বিদ্রুপ করিয়া প্রাচীরে কি লিখিয়াছিল, সে লেখা এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে। রাস্তায় "আমার জন্য ভোট দাও" এরূপ অনুনয় প্রার্থনা আছে। একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম, সম্মুখে বাহির-বাড়ী, তারপর ভিতরে বৈঠকখানা, আহারের গৃহ, শয়ন গৃহ, পূজার গৃহ, রন্ধন গৃহ। বৈঠকখানার প্রাচীরে নানাপ্রকার চিত্র, আজ পর্যন্ত সে চিত্রের বর্ণ ম্লান হয় নাই। ভাণ্ডার গৃহে জালায় শস্য রক্ষিত হইত, সে জালাগুলি তেমনিই আছে! ঘরের প্রদীপ আমাদের দেশের মাটির প্রদীপের ন্যায়, প্রদীপদানগুলিও সেইরূপ। বাড়ীর পশ্চাতে বাগান।

সে কালের থিয়েটার দেখিতে গেলাম, বসিবার বেঞ্চগুলি পাথরের। স্ত্রীলোকের বসিবার জন্য স্থান স্বতন্ত্র ও প্রবেশদ্বার স্বতন্ত্র। থিয়েটারের অনতিদূরেই সৈন্যাগার। চারিজন সৈন্য কি অপরাধে কারাগারে বন্দী ছিল। দেওয়ালে সংলগ্ন লৌহশৃঙ্খলে তাহাদের পদ আবদ্ধ ছিল, সেই হতভাগ্যদের কঙ্কাল সেইরূপ শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

তারপর রোমানদের স্নানাগারগুলি দেখিতে গেলাম। তাহাদের স্নান করিবার বিশেষ আড়ম্বর ছিল, কখনও কখনও তাহারা দিনের মধ্যে সাতবার পর্য্যন্ত স্নান করিত। অনেকে সমস্ত দিন এখানেই কাটাইত। স্নানাগারের সর্বপ্রথমে একটি বৈঠকখানা গৃহ, এই গৃহে সহরের যে স্থানে যে আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার বিজ্ঞাপন থাকিত। স্নানাগারে স্নানের বিবিধ প্রকার সরঞ্জাম। এক ঘরে মার্বেলের কৃত্রিম জলাশয়ে শীতল জল পূর্ণ থাকিত, অন্য ঘরে উষ্ণবাষ্প-স্নানের বন্দোবস্ত। স্নানাগারের নিকটেই ব্যায়াম-গৃহ। এই সকল দেখিয়া আমরা সেকালের এক ডাক্তারের গৃহ দেখিতে গেলাম। এই গৃহে অস্ত্রচিকিৎসার বিবিধ অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে; সে সব অস্ত্র এখনকার অস্ত্র হইতে কোন অংশে হীন নহে।

তার পরে যেখানে বাজার বসিত সে স্থান দেখিতে গেলাম। এখানে দোকানির দাঁড়িপাল্লা, নানা রকমের অলঙ্কার, বেশ-ভূষার দ্রব্যাদি, পাশাখেলার সরঞ্জাম, এমন কি থিয়েটারের টিকিটটি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। নগরের অনেক অংশ এখনও মাটির নীচে, প্রত্যহ খনন করিতে করিতে নূতন নূতন গৃহ বাহির হইতেছে। যেস্থানে খনন হইতেছে আমরা সেস্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম। মজুরেরা ভস্মস্তূপ অতি সাবধানে খনন করিয়া দূরে ফেলিতেছে, ছাদ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হইতেছে, প্রথমে প্রাচীরের একটু চিহ্ন দেখা যায়, তার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত গৃহ বাহির হইতে থাকে। একে একে গৃহস্থালীর দ্রব্য, বাসনপত্র, অলঙ্কার, এমন কি গৃহস্বামীকে পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। একস্থানে গৃহস্বামী কুড়ালী দ্বারা দরজা ভাঙ্গিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল— তাহার কঙ্কালের সম্মুখে কুড়ালী পাওয়া গিয়াছে।

আমরা সমস্ত দিন পর্যটন করিয়া এই লুপ্ত নগরী দেখিলাম। সন্ধ্যা হইলে ক্ষণিক কাল একটি উচ্চস্থানে বসিয়া নগরটি শেষবার দেখিয়া লইলাম। অদূরে ভিসুভিয়সের শিখর হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। আমাদের সম্মুখেই সমস্ত নগরীটি প্রসারিত। এই স্থান হইতে সমস্ত পথগুলি দেখা যাইতেছিল। রাস্তার দুধারে গৃহশ্রেণী, অট্টালিকা ও মন্দির দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু রাজপথে

লোক সমাগম নাই। ছেলেবেলায় গল্পে এক রাজার দেশের কথা শুনিয়াছিলাম। সে রাজ্যে অশ্বশালায় অশ্ব, হাতীশালায় হাতী, রাজগৃহে রাজপুত্র ও রাজকন্যা রহিয়াছে, কিন্তু সকলেই মৃত। তখন সেই গল্পের কথা মনে হইল। মনে হইতে লাগিল, যাহা দেখিতেছি, সবই যেন কল্পনা। এরূপ নিশ্চল, এরূপ জীবনহীন, এরূপ মনুষ্যহীন দেশ কেবল গল্পেই শুনা যায়। কিন্তু হঠাৎ এই পম্পেইর একটি দৃশ্যের কথা মনে হইল। একটি গৃহ ক্রমে ক্রমে ভস্মে ঢাকিয়া যাইতেছিল সেই গৃহে একটি নারী দু'হাতে তাহার শিশুটিকে উচ্চে ধরিয়া রহিয়াছিল। ভস্মস্তূপ ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া দুঃখিনী মাতাকে নিমজ্জিত করিতেছিল। কিন্তু সেই অগ্নির প্রসার হইতে শিশুকে রক্ষা করিতে হইবে। জ্বলন্ত ভস্মস্তূপ তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিয়াও জননীকে একেবারে অবসন্ন করিতে পারে নাই, কি যেন এক মহাশক্তি দুঃসহ যন্ত্রণা দমন করিয়া রাখিয়াছিল। মাতার হস্ত দুইটি মৃত্যু-যন্ত্রণাতেও অবশ হইয়া পড়ে নাই। দুই সহস্র বৎসর পরে সেই ঊর্ধ্বোত্থিত করপুটে সন্তানটিকে পাওয়া গিয়াছে সেই মাতার স্নেহস্পর্শে যেন অতীত বর্ত্তমানের সহিত মিলিয়া গেল। একই দুঃখে, একই স্নেহে, একই মমতায় সেকাল ও একাল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম যেন বান্ধা পড়িল। তখন পম্পেইর মৃত রাজ্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, এবং রাজপথ আমার চক্ষে অকস্মাৎ লোকজনে পূর্ণ হইল!

আগ্নেয়গিরি দর্শন

আমরা রোম নগর দর্শন করিয়া ইটালীর পশ্চিম উপকূলে স্থিত নেপল্‌স্‌ সহরে উপস্থিত হইলাম। নেপল্‌স্‌ সমুদ্রতীরে স্থিত। এরূপ সুন্দর সহর ইউরোপে আর নাই। আমরা যে স্থানে ছিলাম, তাহার সম্মুখেই সমুদ্র। ঘোর নীল জলরাশির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পালভরে যাইতেছে। অনতিদূরে কেপ্রি দ্বীপ।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমের ধনী লোকেরা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে সুন্দর সুন্দর উদ্যান ও প্রমোদ-ভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা নেপল্‌সের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেছে।

নেপল্‌স্‌ সহর এখনও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ এবং জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কিন্তু অদূরেই ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরি এই সুখের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইতেছে!

আমরা একদিন প্রত্যুষে ভিসুভিয়স দেখিতে রওনা হইলাম। ভিসুভিয়স নেপল্‌স্‌ হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত; চারি হাজার ফিট উচ্চ।

আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আগ্নেয়গিরির পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; এস্থানের দৃশ্য অতি ভয়ানক। আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত প্রস্তরের ঢেউ আসিয়া চারিদিক ঢাকিয়াছে। এখন সেই ঢেউগুলি জমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে পাথরগুলি হইতে এখনও ধূম উঠিতেছে। পূর্ব্বে এস্থান হইতে উপরে উঠিতে অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে যাইতে হইত, বন্ধুর পথ ও আগ্নেয়গিরির ভস্মের উপর দিয়া যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইত এবং প্রায় একটি দিন লাগিত। এখন এক প্রকার নূতন ফিউনিকিউলার বা তারের রেল হওয়াতে আধ ঘণ্টার মধ্যে উপরে উঠা যায়।

এক এক গাড়ীতে বারজন লোক বসিতে পারে; এইরূপ একখানা গাড়ী উপরে যায় আর একখানা নীচে আসে। পাহাড়ের গা দিয়া সোজাসুজি উপরে উঠিতে ভয় হয়, তার ছিঁড়িয়া গেলে কি ভয়ানক অবস্থা হয় বুঝিতে পার। এই গাড়ী যেখানে থামে, সেখান হইতে অগ্নিকুণ্ড পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়, সে প্রায় ৫/৭ মিনিটের পথ।

একে ত ভস্মের উপর পা দিয়া স্থির রাখা দুষ্কর, তাহাতে আবার আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল, আমাদের দাঁড়াইয়া থাকাই দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। বাতাস এরূপ ঠাণ্ডা, যে হাত, পা ও মুখ একেবারে অবশ হইয়া যাইতে লাগিল।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই স্থান দর্শন করিতে আসিয়া, সুখের পরিবর্তে আমার কষ্টই বোধ হইতে লাগিল; একদিকে আমার সঙ্গী— অন্যদিকে আমাদের পথপ্রদর্শক সজোরে আমার হাত ধরিয়া উপরে না লইয়া গেলে, আমার অগ্নিকুণ্ড দেখাই হইত না। অনেক দেশ দেখিয়াছি, অনেক পাহাড়ে উঠিয়াছি এবং অনেক ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিবার ক্লেশ চিরদিন স্মরণে থাকিবে। ইটালীয় গভর্ণমেন্টের আদেশে এখানে কয়েকজন পথপ্রদর্শক নিযুক্ত আছে, তাহাদের সঙ্গে অগ্নিকুণ্ড দেখিতে যাইবার আদেশ। পথপ্রদর্শকদিগকে সঙ্গে না লইয়া কেহ উঠিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইজন আমেরিকান ভ্রমণকারী কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া গহ্বর দেখিতে গিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আমরা অতি কষ্টে, উঠিয়া দেখিলাম, উপরে গহ্বর হইতে গন্ধকের ধূম উঠিতেছে, এক স্থান দিয়া গলিত গন্ধক-স্রোত বহিয়া যাইতেছে। আমরা যখন দেখিতে যাই, তখন আগ্নেয়গিরি নিস্তেজ ছিল, তথাপি গন্ধকের ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল।

আঠারশত বৎসর পূর্ব্বে এই নিদ্রিত গিরি একবার অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল! সেই ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টিতে সাতটি নগর পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভেনিস

ইটালীতে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন অপরাহ্নে আমাদের রেলগাড়ী জলরাশির মধ্যে সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল।

প্রথমতঃ এই দৃশ্যে একটু উদ্বিগ্ন হইলাম। পরে কৌতূহল ও বিস্ময়ে সেই ফেনিল জলরাশির সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, আমাদের গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিল। অন্যান্য ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী থাকে কিন্তু এখানে গাড়ী চলে না। অন্যান্য সহরের ন্যায় এখানে রাস্তা নাই—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে, খাল দিয়া যাইতে হয়। নৌকা এদেশের বাহন। এদেশের নৌকাকে 'গণ্ডোলা' বলে। ষ্টেশনে অনেক গণ্ডোলা যাত্রীদের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। মাঝিরা দেখিতে দেখিতে আমাদের জিনিষপত্র নৌকায় উঠাইয়া লইল। রাত্রিকালে অপরিচিত জলরাশির মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছি ভাবিয়া শঙ্কিত হইলাম। নৌকাখানি কিন্তু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিঃশব্দে বৃহৎ খাল হইতে ছোট ছোট কতকগুলি খাল অতিক্রম করিয়া হোটেল অভিমুখে চলিল।

এই জলময় নগরটির উৎপত্তির বৃত্তান্ত শুনিলে আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়া মনে হইবে। সমুদ্রে প্রবাল-দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া পরে বৃহৎ হইয়াছে, ভেনিস সহরটিও সেইরূপ সমুদ্র মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। এখন ভেনিসকে 'এড্রিয়াটিক সাগরের রাণী' বলে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহার অস্তিত্বই ছিল না।

মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে ঐ এড্রিয়াটিক সাগরের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমুদ্র মধ্যে ভেনিস সহর নির্ম্মাণ করিয়াছে। মানুষ মানুষের নিকট জমি কাড়িয়া লয়, কিন্তু মানুষ সমুদ্র হইতে তাহার অংশ কাড়িয়া লইয়া রাজ্য বৃদ্ধি করে, এমন কখনও

শুনিয়াছ কি? ভেনিস তাহার দৃষ্টান্ত।

'আল্প্' ও 'টাইরল্' হইতে ছয়টি স্রোতস্বিনীর জল এস্থানে সাগরের সহিত মিলিত হইত, ক্রমে তাহাদের মৃত্তিকা ও বালুকার স্তূপ জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গঠিত হইতে লাগিল। ভাটার সময় দ্বীপগুলি ভাসিয়া উঠিত, আবার জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত। এরূপ স্থানে কেহ ইচ্ছা করিয়া বাস করে না, কিন্তু বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি খুলিয়া যায়। ভেনিস নামে এক জাতীয় লোক পাহাড় হইতে শত্রুর তাড়নায় পলায়ন করিয়া এই জলমগ্ন দ্বীপে আশ্রয় লয়। তাহারা চতুর্দ্দিকে কাঠের খুঁটি পুতিয়া দ্বীপগুলিকে বাসস্থানের উপযুক্ত করিয়া লইল। চারিদিকে জল, সুতরাং শত্রুরা এখানে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

ক্রমে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সহরটিও বাড়িতে লাগিল। এইরূপে ক্ষুদ্র স্থানটি বৃহৎ হইয়া উঠিল। তখন সকলে মিলিয়া একজন রাজা মনোনীত করিয়া বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তার করিতে মনোনিবেশ করিল।

রাজা প্রথমে দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। সেতুদ্বারা দ্বীপগুলির একত্র করা হইল, যাতায়াতের সুবিধার জন্য খাল কাটান হইল। সমুদ্রের ঢেউ যাহাতে সহরটিকে ভাসাইয়া না লইতে পারে, এজন্য বড় বড় বাঁধ প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি শ্বেত প্রস্তরের হর্ম্ম্যে পরিণত হইল। ভেনিস অতি শীঘ্রই বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করিল।

ক্রমে প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভেনিস ইউরোপের সকল জাতির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিল। ১৩ শত বৎসর অতুল খ্যাতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ফরাসীদের হস্তগত হয়। ভেনিসের ইতিহাস পাঠ করিলে ও তাহার পুরাতন কীর্ত্তির কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আমরা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভেনিসে ঘোড়ার গাড়ী নাই, নৌকা ভেনিসবাসীদের প্রধান বাহন। এই নৌকাগুলির বিষয় কিছু লিখিতেছি। এক এক জন মাঝি কাল কাপড় পরিয়া, এক এক খানি দাঁড় হাতে লইয়া, কাল মখ্‌মলে মণ্ডিত এই

গণ্ডোলাগুলিকে অতি ক্ষিপ্রগতিতে চালাইয়া থাকে। পূর্ব্বে নগরবাসীরা নিজ নিজ গণ্ডোলা বহুমূল্য আস্তরণে সজ্জিত করিত; কিন্তু কোন কারণে ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে নিয়ম হইল যে, সকল গণ্ডোলাই কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত গণ্ডোলাগুলি কাল মখ্‌মলে মণ্ডিত। কেবল মাত্র বিদেশীয় রাজদূতের গণ্ডোলা রঙ্গিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত। ভেনিসবাসীরা ষড়যন্ত্র করিতে বিশেষ পটু। অন্ধকার রাত্রিতে কাল রঙের নৌকায় নিঃশব্দে যাতায়াত করে, কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না। অন্যদিকে বিদেশী রাজদূতের নৌকা বিশেষরূপে সজ্জিত বলিয়া, তাহার গতিবিধি সহজেই জানা যায়। মাঝিরা এক এক দাঁড় লইয়া কত দ্রুত গতিতে যাতায়াত করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বহুসংখ্যক নৌকার মধ্যে অবাধে চলিয়া যায়, কোন বিপদ ঘটে না। আমরা 'সেন মার্কো' নামক স্থানে গেলাম। ইহা একটি চতুষ্কোণ উন্মুক্ত স্থান। ইউরোপে এই স্থানটি অতিশয় বিখ্যাত, এই স্থানে সন্ধ্যার সময় সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়; হাজার হাজার লোক সন্ধ্যাকালে এখানে আসিয়া চা, কফি পান করেন ও গল্প করেন। ভেনিস সহর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে, প্রতিপদে প্রস্তরস্তম্ভে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি দেখা যায়। এই স্থানটির চতুর্দ্দিকই ঐতিহাসিক চিহ্নে পূর্ণ। এক দিকে 'কেম্পেনিল' নামক উচ্চ স্তম্ভ। উহা আমাদের মনুমেণ্ট অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

অনেক সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। নেপোলিয়ান ভেনিস জয় করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠেই এই দুর্গম সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন।

সেন মার্কোর চারিদিকে দোকান; এই সকল দোকানে নানা রকম মনোহারী দ্রব্য সাজান। তাহার মধ্যে ভিনিসীয় কাচ জগদ্বিখ্যাত। সেই সকল কাচের দ্রব্যের রঙ কিরূপ সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না, যেন রামধনু খেলিতেছে।

এই সকল দোকানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলাম, প্রাঙ্গণ অসংখ্য পারাবতে পূর্ণ হইতেছে; শুনিলাম রাজকোষ হইতে ইহাদিগকে প্রত্যহ দুই ঘটিকার সময় আহার্য্য দেওয়া হয়।

বহুশত বৎসর পূর্ব্বে কপোতের সাহায্যে ভেনিসবাসীরা একবার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। সেই অবধি নগরের অধিবাসীগণ ইহাদের সযত্নে

প্রতিপালন করেন। আমরা এই স্থান হইতে সন্নিহিত রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম।

এই রাজবাটীতে বিখ্যাত চিত্রকরদিগের চিত্র, পুরাতন কালের অস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জাদি এবং পুরাতন পুস্তকাদি সযত্নে রক্ষিত। একস্থানে আমরা ছয় শত বৎসরের অতি পুরাতন একখানি ম্যাপ দেখিলাম। সেই ম্যাপের সহিত আধুনিক ম্যাপের অনেক প্রভেদ। কারণ তখন পৃথিবীর বৃত্তান্ত খুব কমই জানা ছিল। ভূগোল বিবরণ লিখিতে তখনকার ছাত্রদের আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইত না।

রাজপ্রাসাদের দ্বারে প্রকাণ্ড সিংহ মূর্ত্তি; সহরের অন্যান্য স্থানেও সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কাহারও নামে বেনামা দরখাস্ত কিম্বা অন্য অভিযোগ আনিতে হইলে, কাগজে লিখিয়া এই সকল সিংহমূর্ত্তির মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিলেই তাহা রাজ দরবারে পৌঁছিত। এই প্রকারে কত নির্দ্দোষ ব্যক্তি বিনা অপরাধে ঘোরতর অত্যাচার সহ্য করিত তাহার সংখ্যা করা যায় না।

যাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ হইয়াছে, হঠাৎ সে একদিন অদৃশ্য হইত। অন্ধকার রাত্রে গুপ্তচর তাহাকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিত; পরদিন গুপ্ত-মন্ত্রণাগৃহে তাহার দণ্ড স্থির হইত। রাজার নামে ১০ জন মন্ত্রীই সমুদয় বিচার করিতেন। আমরা সেই ভীষণ মন্ত্রণা-গৃহ দেখিতে গেলাম। এখানে কত হতভাগ্য যাতনা ভোগ করিয়াছে, মনে করিলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। আমাদের দেশের নবাবী আমলের নিষ্ঠুরতার কথা অনেক শুনা যায়, কিন্তু ইউরোপে ২/১ শত বৎসর পূর্ব্বে বিচারের নামে কত নৃশংস অত্যাচার হইত, তাহা কল্পনা করা যায় না।

মন্ত্রণা-গৃহটি খালের এক পারে। বন্দীগণ খালের অপর পার হইতে একটি সেতুর উপর দিয়া আনীত হইত; যে হতভাগ্য একবার এই সেতু অতিক্রম করিত তাহার মৃত্যু নিশ্চয়!

সেতু পার হইবার সময় সে শেষবার এই পৃথিবী দেখিয়া লইত। এই জন্য এই সেতু 'Bridge of Sighs' বলিয়া অভিহিত।

বন্দীরা মন্ত্রণা-গৃহ হইতে নিকটস্থ কারাগারে নীত হইত, সেই কারাগার যেন

সাক্ষাৎ যমপুরী! —মাটীর নীচে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিবার পথ নাই। প্রাচীর সংলগ্ন শৃঙ্খলে বন্দী আবদ্ধ থাকিত, কেবল মৃত্যুর আঘাতে সেই শৃঙ্খল ভগ্ন হইত।

আমরা এই স্থান হইতে যখন বাহিরে ফিরিয়া আসিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। অস্তপ্রায় সূর্য্যের কিরণে আড্রিয়াটিকের জল ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল, দূরে সারি সারি নৌকার শ্রেণী। লোকে বিচিত্র বেশে দলে দলে ভেনিসিয়ান গণ্ডোলাতে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছে। কোন কোন নৌকা গায়কদলে পূর্ণ, তাহাদের কণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

লণ্ডনের গল্প

এখন লণ্ডনের কথা না জানে এমন লোক অতি অল্পই আছে। পূর্ব্বে যেখানে যাইতে একমাস লাগিত, এখন সেস্থানে ১৮ দিনে যাওয়া যায়। এখন আর বিলাতকে বেশী দূর বলিয়া মনে হয় না, —জাহাজ এবং রেল হওয়াতে অত দূরবর্ত্তী স্থানও আমাদের সন্নিকট হইয়াছে।

জাহাজে চড়িয়াই ইংরাজের শৃঙ্খলা ও কার্য্যকুশলতার শত পরিচয় পাইয়াছিলাম। একটি ছোটখাট রাজপুরীর ন্যায় সুসজ্জিত জাহাজ শত শত প্রাণী বক্ষে করিয়া, দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত চলিয়া অতল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে, দেখিলে শতমুখে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। সাত শত লোক জাহাজে বাস করিতেছে, অথচ ঠিক সময়ে স্নান আহারাদি সমুদয় চলিতেছে। জাহাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কুঠরি, এক একটিতে তিন চারি জনের শয়ন করিবার বন্দোবস্ত আছে। তিন চারি শত লোকের একসঙ্গে আহার করিবার গৃহ, বৈঠকখানা (Drawing room) প্রভৃতি সুন্দর মখ্‌মলে সাজান। টবের মধ্যে ফুলগাছ এই সব গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। সাত শত লোকের আহার্য্য ও আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্যই জাহাজে থাকে। চারি পাঁচদিন অন্তর কোন বন্দরে জাহাজ থামিলে, কেবল এঞ্জিনের কয়লা ও আহারের জন্য খাদ্যসামগ্রী লওয়া হয়।

ইংরাজেরা জাহাজে নানা প্রকার খেলা ও আমোদে সময় কাটান। সেখানেও ক্রিকেট খেলা, তীর ছোড়া, কইটস্ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। কখনও কখনও মাস্তুলের উপর বোতল রাখিয়া, বন্দুক ছুড়িয়া তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয়। এই সকল খেলাতে আবার জাহাজের কর্ম্মচারীদের সহিত জাহাজের

আরোহীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। রাত্রে নানা প্রকার ঐকতানিক বাদ্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাচ প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া জাহাজের গতি লইয়াও আন্দোলনের বিরাম নাই। প্রতিদিন জাহাজ কতটা অগ্রসর হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যাঁহারা যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চাঁদা করিয়া প্রাইজ দেওয়া হয়।

ইংরাজজাতির কাজের সময় যেমন একাগ্রতা, খেলার মধ্যেও সেইরূপ একাগ্রতা ও উৎসাহ। তাঁহারা যেখানেই যান, যাহাই করুন, শারীরিক ব্যায়াম ও আমোদ-প্রমোদ কখনই পরিত্যাগ করেন না।

জাহাজ হইতে নামিয়া ষ্টেশনে উঠিয়া দেখিলাম, অন্য এক পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমাদের দেশের ষ্টেশনের মত এখানে গোলমাল চীৎকার কিছুই নাই। এখানেও নিঃশব্দে কলের মত কাজ চলিতেছে। আমরা জিনিষপত্র নামাইলাম, একজন মুটে আসিয়া সেগুলি একটা টানা গাড়ীতে চাপাইয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং যে গাড়ীখানি সম্মুখে ছিল তাহাতে চাপাইয়া দিয়া নিজের পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমরা আমাদের গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। ভাড়াটে গাড়ীগুলি সারি সারি রহিয়াছে, যেখানা আগে, তাহারই আগে ভাড়া হইতেছে, এস্থানেও কোন গোলমাল নাই।

লণ্ডন সহরে সমুদয় কার্য্যেই এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলাম, রাস্তায় অসংখ্য গাড়ীঘোড়া, লোকজন, বাইসিকল, ছোট ছেলেদের পিরাম্বুলেটার, এবং বৈদ্যুতিক গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। প্রথমে এত জনতা দেখিয়া গাড়ীতে উঠিতে আমার ভয় হইত। সর্ব্বদাই মনে হইত কখন কোন দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু সকলেই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলেন বলিয়া, দুর্ঘটনা খুব অল্পই ঘটে। গাড়ী চালাইবার যে নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। রাস্তার জনতা তোমরা কল্পনা করিতে পার না। এত গাড়ীঘোড়া যাতায়াত করে যে, সময় সময় চৌরাস্তার মোড় ভিন্ন অন্য স্থান দিয়া রাস্তার অপর পারে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমি কতবার

এইরূপ রাস্তা পার হইতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছি। চৌরাস্তার মোড়ে পার হইবার বেশ সুবিধা। সেস্থানে সর্ব্বদাই একজন পুলিশ থাকে। পাঁচ ছয় জন লোক একত্র হইবামাত্র সে তাহার এক হাত তুলিয়া অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অমনি যত গাড়ীঘোড়া মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়া যায়। উভয় পার্শ্বের লোক সরিয়া গেলে, পুলিশের লোক হাত নামাইবা মাত্র গাড়ী-ঘোড়া পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। আমি পুলিশের লোকের এই অঙ্গুলি নির্দ্দেশের শক্তি দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, অঙ্গুলি সঙ্কেত দেখিবামাত্র শত শত গাড়ী থামিয়া যাইতেছে, স্বয়ং মহারাণীর গাড়ী পর্য্যন্ত এই সঙ্কেতের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কত অম্নিবাস ও ট্রামগাড়ী আছে, তথাপি লণ্ডনের রাস্তায় লোকজনের ভীড় কমে না। মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রেলের রাস্তা করা হইয়াছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে রেলের গাড়ী চলে, তাহাতেও অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, ইহা হইতেই লণ্ডনের জনতার কতক পরিচয় পাইবে।

লণ্ডন সহরের জাঁকজমক দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। মনে হয় ইংরেজ জাতি সমস্ত পৃথিবী হইতে ধন আহরণ করিয়া এই রাজনগরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

ইংরাজকে বেনে বণিকের জাত অথবা দোকানীর জাত বলে, এ কথা সত্য; কারণ এমন সুসজ্জিত দোকান-শ্রেণী আর কোথাও দেখা যায় না। সব দোকানেই আয়নার দরজা, সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া সমুদয় দেখা যায়। এই সকল দোকান দেখিয়া জিনিষ কিনিতে যাহার লোভ না হয় সে মানুষ নহে। প্রতি রাস্তায় কত গহনার দোকান, কত পরিচ্ছদের দোকান, কত মনোহারী জিনিষের দোকান, ঔষধের দোকান, ফুলের দোকান, তাহার সংখ্যা নাই। তাহা ছাড়া চা খাইবার জন্য এবং আহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হোটেলও আছে।

ফলফুলের দোকানের শোভা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করিতে পারিনা। মাছের দোকানগুলিতেও একটুকু গন্ধ নাই, —নানা প্রকার মাছ সুন্দর মার্ব্বেল পাথরের উপর বরফে রক্ষিত।

ইংরাজ জাতি যে সৌন্দর্য্যের সেবক তাহা সকল কার্য্যেই দেখিতে পাইলাম। গৃহপালিত পশু পক্ষী প্রভৃতির প্রতি ইহাদের অত্যন্ত যত্ন। কঙ্কালসার জন্তু সেদেশে আমি কখনও দেখি নাই, ঘোড়া, গরু, গাধা ভেড়া প্রভৃতি সব জন্তু দেখিতে সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট। পশু পক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুরা সেখানে সন্তানবৎ প্রতিপালিত হয়।

আমাদের ইডেন গার্ডেনের ন্যায় লণ্ডনে অনেকগুলি উদ্যান আছে। তাহাতে কত সুন্দর সুন্দর পশু-পক্ষী প্রতিপালিত হয়। অপরাহ্নে বালক বালিকারা সেই সকল উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া, ইহাদিগকে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেয়। উদ্যানস্থ সরোবরে ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসাইয়া বালক বালিকারা নানা প্রকার খেলা করিয়া থাকে।

দুই প্রহরের সময় এই সকল বাগানে এক অপরূপ দৃশ্য হয়। তখন বালক বালিকাদের সহিত অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সম্মিলন হইয়া থাকে। একদিকে যেমন ঠেলা গাড়ীতে ক্ষুদ্র শিশুরা বেড়াইতে আসে, অপর দিকে তেমনই অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও ঠেলা গাড়ীতে এই সময় বায়ু সেবন করিতে বাহির হয়।

লণ্ডনে দেখিবার ও শিখিবার অনেক জিনিস আছে; —কত প্রকার মিউজিয়ম, কত প্রকার পাঠাগার বা লাইব্রেরী, কত প্রকার চিত্রশালা, গানবাদ্যের জন্য কত প্রকার হল, বড় বড় লোকের কত স্মৃতিচিহ্ন, জাতীয় জীবন উপযোগী কত প্রকার পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ গৃহ। এক একটি স্থান দেখিতে এক দিন করিয়া যায়। এই সকল স্থানের বর্ণনা করা সম্ভব নহে, তবে, 'ব্রিটিশ মিউজিয়ম', 'ন্যাশান্যাল গ্যালারী', ও 'ওয়েস্টমিনিস্টার এবি', এই তিনটি স্থানের নাম না করিয়া লণ্ডনের কথা শেষ করা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ম নামক পুস্তকাগারে পৃথিবীর অতি পুরাতন ও বহুমূল্য পুস্তকসকল রক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া নানা ভাষায় প্রধান পুস্তক এমন কি, বঙ্গভাষায় প্রধান পুস্তকও এখানে পাওয়া যায়।

ন্যাশান্যাল গ্যালারি বা জাতীয় চিত্রশালাতে বহুব্যয়ে ইংরাজ চিত্রকরদিগের চিত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি— এখানে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত

যত রাজা ও যত বীরগণ জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত আছে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি

তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়সে বড়, তাহারা হয়ত কবি লংফেলোর[১] জীবন-সঙ্গীতে নিম্নের লাইন কয়টি পড়িয়াছ—

Lives of great men all remind us.
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time.

আমার ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি দেখিয়া স্মরণ হইল, আজ এক বৎসর হইল এস্থানটি দেখিয়াছি, কিন্তু সেই প্রশস্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্য আজও আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।

এই প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে দেশে মহত্ত্বের এরূপ সম্মান, সে দেশে মহৎ চরিত্র গঠিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এই সীমাবদ্ধ স্থানটির মধ্যে ইংলণ্ডের আট নয় শত বৎসরব্যাপী ইতিহাসের চিহ্ন দেখা যায়। একদিকে ইংলণ্ডের সমস্ত রাজাদের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভ, মহাকবি, লেখক, বহুমনীষাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রী, বাগ্মী, ধর্ম্মবীর— এককথায় গত আট নয় শতাব্দীর বিখ্যাত ইংলণ্ডবাসীদের দেহাবশেষ এই মহাসমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে। ইংরেজ বালকদিগের অল্পবয়স হইতে এই সকল স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়া, হৃদয়ে মহত্ত্বের অনুকরণ স্পৃহা হওয়া স্বাভাবিক। বিদেশবাসী হইয়াও এই স্থান দর্শন করিয়া আমার শরীর

---

১. কবি লংফেলো— হেনরী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লংফেলো এবং জীবন সংগীত কবিতার ইংরাজী নাম A Pasalm of Life.

রোমাঞ্চিত হইল। যদি ইংরেজ হইতাম, তবে এস্থান দর্শন করিয়া, জন্মভূমির জন্য আমারও অনুরাগ বৃদ্ধি হইত তাহাতে সন্দেহ নাই; মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবন সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহাদের কীর্ত্তি অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া স্বদেশবাসীর হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে।

আমাদের দেশেও কি মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই? করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মহত্ত্ব আমরা প্রকৃতরূপে পূজা বা অনুকরণ করিতে শিখি নাই।

আমাদের দোষেই তাঁহারা মৃত। কিন্তু এই ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে শত শত অমরগণ এখনও বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের প্রিয় দেশবাসীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতেছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়। যে উইল্‌বারফোর্স বিদেশবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার লুপ্ত জীবন ব্রাইট্, ব্রাড্‌ল ও ব্রসেটের জীবনে পুনর্জীবিত দেখা যায়।

এখন আমরা যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার দেখি, পূর্ব্বে ইহা একটি সামান্য মন্দির মাত্র ছিল। ইতিহাসে কথিত আছে যে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা এড্‌ওয়ার্ড দি কন্‌ফেসারের সময় পুরাতন মন্দিরের স্থানে বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এড্‌ওয়ার্ড যখন নর্ম্ম্যাণ্ডী দেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, রোমে সেন্টপিটারের মন্দিরে তীর্থ করিতে যাইবেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আসিলে, প্রধান পুরোহিত পোপ তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংলণ্ডে সেন্টপিটারের নামে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। প্রবাদ এই যে, এড্‌ওয়ার্ড স্বপ্নে সেন্টপিটারের নিকট হইতে এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ পান। সে যাহা হউক, ১০৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরাতন মন্দিরটির নিকট নূতন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তারপর ইংলণ্ডে নানাবিধ অন্তর্বিপ্লব হওয়াতে কোন রাজাই ইহার উন্নতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয় হেন্‌রির সময় রাজ্যে কতকটা শান্তি স্থাপন হওয়াতে, তিনি এই মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হন।

সেই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের সময় ইহার শ্রী বৃদ্ধি পাইতে থাকে;

সেই জন্য এই মন্দিরে আট শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর স্থাপত্য কার্য্যের সমাবেশ দেখা যায়। সে সকল কারুকার্য্যের বর্ণনা অসম্ভব। স্থানে স্থানে এইরূপ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সে সকল দর্শন করিয়া হৃদয় মহান ভাবে পূর্ণ হয়, এবং মনে হয় প্রতি যুগের শিল্পীগণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলিকে যেন মূর্ত্তিমতী করিয়া এই স্থানকে পরমেশ্বরের অর্চ্চনার উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে কত কত উপাসনা মন্দির আছে, কিন্তু তথাপি বহুদূর হইতে লোকে এই পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেছেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় এই মন্দিরের সংসৃষ্টে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এখনও তাহা চলিতেছে। পূর্ব্বে এই মন্দিরে রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতেরা বাস করিতেন, এখন সেই সকল স্থান শূন্য হইয়া রহিয়াছে। কারণ এলিজাবেথের সময় হইতে প্রটেষ্টাণ্টদের উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হয়। এখন তাঁহারাই এবি সংলগ্ন গৃহে বাস করেন। কেবল যে, মহাপুরুষের সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া এবি প্রসিদ্ধ তাহা নহে, পৃথিবীর কোন মন্দিরেই এরূপ পার্থিব ও অপার্থিব ভাবের সমাবেশ দেখা যায় না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এস্থান রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তুমুল আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল, আবার এই পার্থিব মন্দিরের আশ্রয়ে কত পলায়নপর রাজকুমার এবং যোদ্ধা লুক্কায়িত থাকিতেন। এই স্থানে মহাসমারোহে রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কয়েকজন রাজার বিবাহও এই স্থানেই হইয়াছে, আবার এই স্থানেই তাঁহাদের অনন্ত নিদ্রা-ক্ষেত্র।

আমরা প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বর্ত্তমান উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলাম; ইহারও চতুর্দ্দিকে স্মৃতিস্তম্ভ, মধ্যস্থলে পুরোহিতের জন্য উচ্চ বেদী; তারপর তিন চারিশত লোকের বসিবার উপযুক্ত আসন, পশ্চাতে সঙ্গীতের জন্য প্রকাণ্ড অর্গ্যান যন্ত্র ও গায়কদের বসিবার স্থান। ইহার অদূরে ক্যানিং-ওয়ারেন হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইংরেজ-সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্যকারী ইংরেজের স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া আমরা কবিদিগের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। ইংরাজীতে এই স্থানকে Poets Corridor বলে।

এস্থানেই নাকি এবি দর্শকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাপন করেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ অন্যান্য বীরদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিপ্লব পূর্ণ হয়, কিন্তু কবিদিগের স্মৃতি-স্তম্ভ দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের অনেক দিনের পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। এখানে চসার হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন পর্য্যন্ত প্রধান কবিদিগের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। এস্থান হইতে আমরা সপ্তম হেনরীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহা এবির সর্ব্বোৎকৃষ্ট মন্দির; ইহা নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এখানে রাজ্যাভিষেকের অতি পুরাতন আসন রক্ষিত আছে, এখনও সেই আসন ব্যবহৃত হয়। কিয়দ্দূরে রাজা জনের লিখিত মেগ্নাকার্টা (Magna Charta) দেখিলাম।

এস্থানে অন্যান্য যে সকল স্মৃতি-স্তম্ভ দেখিলাম, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেখিয়া মনে হইল, ইংলণ্ড হইতে বহু দূরে, বিদেশে, বিপদে অতি সামান্য সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিবার সময় কেন ওয়েলিংটন ও নেল্‌সনের কথা স্মরণ করে। এই স্থানে তাঁহাদের যে ছিন্ন-পতাকা রক্ষিত হইয়াছে, সেই পতাকার গৌরব তাহারা বিপদেও রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়। এইরূপ নামহীন, খ্যাতিহীন, অজ্ঞাত, সামান্য সৈনিকের রক্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ইহার মূলে জাতীয় গৌরবের স্মৃতি এবং এই ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে সেই জাতীয় মহিমার স্মৃতি জাজ্জ্বল্যমান!

পার্লেমেণ্ট দর্শন

টেম্‌স্ নদী ইংলণ্ডের রাজধানীর গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত। সহরের নিকট তাহার দুই পার্শ্বই বাঁধান, দুইদিকে সুন্দর পাকা রাস্তাতে গাড়ী ঘোড়া লোকজন যাতায়াত করিতেছে। একদিকে লণ্ডনের দুর্গ প্রভৃতি নানা সুসজ্জিত হর্ম্ম্য বিরাজ করিতেছে। অন্যদিকে হাসপাতাল ও কলকারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ রহিয়াছে। নদীর দুইপার্শ্বে গমনাগমনের জন্য বহুসংখ্যক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অল্প পয়সাতে যাতায়াতের উপযোগী জাহাজেরও অভাব নাই।

লণ্ডন সহর হইতে দূরে টেম্‌স্ নদীর তীরের শোভা অপূর্ব্ব; নানা বৃক্ষলতা ও গ্রাম্যছবি তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সকল দর্শনীয় স্থানের মধ্যে অদূরবর্ত্তী পার্লেমেণ্ট মহাসভাগৃহ যে কারুকার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। শিল্প-নৈপুণ্যে ইহা শুধু লণ্ডনের কেন, ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানভুক্ত।

অনেকদূর হইতে এই গৃহের ঘড়ি থাকিবার উচ্চ চূড়াটি ও অন্যান্য চূড়াগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে এই গৃহ এবং সভার কার্য্য দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; কিন্তু আমাদের পৌঁছিবার কিয়ৎকাল পরেই গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে সভার কার্য্য স্থগিত হয়, সুতরাং আমি উক্ত সভার কার্য্য দেখিবার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আমাদের ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব হইল, তাহাতেই সভার নূতন সেশনের কার্য্য আরম্ভ হইলে, আমি প্রবেশের পাশ সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

দর্শকদের সভাগৃহে প্রবেশের জন্য পাশ সংগ্রহ করা আবশ্যক। প্রত্যেক সভ্যের তিনখানা পাশ দিবার অধিকার আছে। পুরুষ দর্শকদের বসিবার স্থানটি প্রশস্ত থাকাতে, তাহাদের পাশ সংগ্রহ করিতে অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রী-দর্শকদের স্থানটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাই তাহাদের পাশের জন্য সভ্যদের মধ্যে সুরতি খেলা (ballot) হয়। যে যে সভ্যের ভাগ্যে নাম উঠে, তাঁহারাই কেবল পাশ দিতে পারেন। এই জন্য কখন কখন পাশ-প্রার্থিনীকে অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে সার জন লাবক (Sir John Lubbock) মহাশয়ের নিকট হইতে আমি দুইখানা পাশ পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পার্লেমেণ্টের সভ্য সোয়ান সাহেবের পত্নী আমাকে উক্ত সভাতে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি নিজের গাড়ীতে আমাকে লইয়া গেলেন। মহাসভা গৃহটি একটি প্রাসাদ বিশেষ, —কোথা হইতে কোথায় প্রবেশ করিলাম, বুঝিতে পারিলাম না। গাড়ী খিলান দরজার নীচ দিয়ে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিয়া, অবশেষে এক ক্ষুদ্র দরজার নিকট থামিল। আমরা নামিয়া একটা কল (lift) দ্বারা ত্রিতলে উঠিলাম; সেখানে পাশ দেখাইয়া স্ত্রীলোকদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলাম। সে স্থানটি দেখিয়া লক্ষ্ণৌ নবাবদের প্রাসাদের অন্তঃপুরের কথা মনে পড়িল। ঠিক তেমনি ছিদ্র-বিশিষ্ট প্রাচীর; যাহারা সম্মুখে বসেন, তাঁহারাই কেবল সেই ছিদ্র দিয়া নীচের সমুদয় কার্য্য দেখিতে পান, পিছনের আসন হইতে দেখিবার সুবিধা নাই। হলের এক পার্শ্বে রক্ষণশীল, অন্যপার্শ্বে উন্নতিশীল সভ্যদের বসিবার স্থান। পশ্চাতের দিকে সভাপতির (speaker) বসিবার উচ্চ স্থান। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের পার্শ্বে কাগজপত্র লইয়া কর্ম্মচারীগণ উপবিষ্ট। উপরে দর্শকের ও খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বসিবার গেলারী।

সভ্যেরা সকল সময় সভাগৃহে উপস্থিত থাকেন না, যাঁহারা আলোচনা (debate) করেন, তাঁহারা, এবং সে বিষয়ে যাঁহাদের বক্তব্য আছে, সে সভ্যেরাই সাধারণতঃ উপস্থিত থাকেন। অন্যান্য সভ্যেরা সর্ব্বদাই ভিতর বাহিরে যাওয়া আসা করেন। যাঁহারা গৃহে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ বা সেখানে বসিয়া টুপী বা রুমাল মুখের উপর রাখিয়া নিদ্রা যান, কেহ বা নোট লেখেন,

কেহ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা শ্রবণ করেন; বেচারা সভাপতিকে কিন্তু সমস্ত সময় সেখানে বসিয়া থাকিতে হয়।

প্রত্যেক সভ্যই নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া, কথা বলিবার মত অতি সহজ ভাবে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে কেবল দরকারী ও জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতে হয়—তাহা না হইলে সেখানে চলে না। আমি যে দিন যাই, সেদিন কলকারখানা সম্বন্ধীয় আইন (Factory Bill) লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। দেখিলাম, বক্তা প্রকাণ্ড একতাড়া কাগজ হাতে লইয়া বক্তৃতা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কাগজ হইতে দৃষ্টান্ত তুলিতেছেন। শুনিলাম, বক্তা শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে পার্লামেণ্টের সভ্য হইয়া, গরীবদের দুঃখ নিবারণে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। বক্তৃতার বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট আপত্তি না করাতে, কলকারখানার স্বত্বাধিকারীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায়, অল্পব্যয়ে সামান্য রকমের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; সে সকল গৃহ চাপা পড়িয়া বৎসর বৎসর অনেক লোক মারা যায়। অতএব এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের একটা আইন থাকা উচিত।

বক্তা কোন্ কোন্ বৎসর কত লোক মারা পড়িয়াছে, কত লোক পঙ্গু হইয়াছে, এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। বিপক্ষীয় সভ্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হাত দিবার আবশ্যক নাই।

বৎসরে সাত আটটি লোক হয়ত মারা পড়িতেছে তাহার জন্য এত আন্দোলন! আমরা হইলে ভ্রূক্ষেপও করিতাম না, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

এখানকার আলোচনা প্রণালী অতি সুন্দর। বক্তা স্বপক্ষে বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় বিপক্ষীয় সভ্যের কিছু বলিবার আবশ্যক হইলে, তিনি উঠিয়া দাঁড়ান, বক্তা অমনি বসিয়া পড়েন। বিপক্ষীয় সভ্যের বক্তব্য শেষ হইলে, পূর্ব্ব বক্তা উঠিয়া তাহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া (অথবা স্বপক্ষীয় কেহ সেই যুক্তি খণ্ডন করিলে পর) আবার নিজ বক্তব্য বলিতে থাকেন।

এ বিষয়ের বাদানুবাদ শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে আমার যেরূপ আগ্রহ হইয়াছিল,

তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম, সভ্যেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও কিরূপে অক্লান্তভাবে বাদানুবাদ করিয়া সময় কাটান।

আমাকে সমুদয় প্রাসাদটি দেখিতে হইবে, তাই সঙ্গিনীর ইঙ্গিতে অযথা বাধ্য হইয়া সে স্থান ছাড়িলাম। বাহিরে আসিলে সোয়ান সাহেব আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে চলিলেন। তিনি এতগুলি ঘরের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন যে, আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল; আমি নিজে নিশ্চয়ই পথ ভুলিতাম।

অবশেষে অনেক ঘুরিয়া আমরা মহাসভার 'লবি' (Lobby) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। পার্লামেণ্ট সভার সমুদয় গৃহের মধ্যস্থিত গম্বুজাকার স্থানটীকে 'লবি' বলে। এই মধ্যস্থিত স্থান হইতে 'লর্ডদের' সভাগৃহে, 'কমন' বা সাধারণের সভাগৃহে এবং অন্যান্য সমুদয় গৃহে যাওয়া যায়। এখানে অনেক সভ্যের দর্শন পাইলাম, কেহ বা গল্প পরিহাস করিতেছেন, কেহ কেহ বা হাঁটিতে হাঁটিতে নানা প্রকার তর্ক করিতেছেন—মন্ত্রণা-সভা হইতে এখানেই অধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ইহার নিকট 'পোল' (Poll) দিবার ঘর। কোন আলোচ্য বিষয় লইয়া যখন মতভেদ হয়, তখন সভ্যেরা এখানে আসিয়া নিজ নিজ 'ভোট' দেন।

'লবি' পার হইয়া লর্ডদের সভাগৃহে গেলাম। পথে পুরাতন রাজাদের সময়কার নানা রকম ছবি দেখিলাম।

লর্ডদের গৃহটি সাধারণদের গৃহ অপেক্ষা ভালরূপে সজ্জিত। বসিবার আসনগুলি লাল মখ্‌মলে মণ্ডিত, আয়নাগুলিতে নানা বর্ণের ছবি আঁকা। মহারাণীর জন্য সুন্দর মখ্‌মলে-মণ্ডিত সিংহাসন একধারে রক্ষিত। অনেক সময় এই আসন ব্যবহার হয় না।

সাধারণ সভ্যেরা তাহাদের সজ্জাহীন সামান্য গৃহই অধিক পছন্দ করেন। তাঁহারা বলেন, ঐরূপ গৃহেই বেশ কার্য্য সম্পন্ন করা যায়।

এই ত্রি সৌধের মধ্যে 'ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল' (Westminster Hall) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্ট বাদী, এখানে তাহার বিচার হয়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে বিচার চলিতেছিল।

এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচার হইয়াছিল। বিখ্যাত বাগ্মী 'বার্ক'

(Burke) এবং 'সেরিডেন' (Sheridan) ভারতবাসীদের পক্ষ হইয়া এই স্থানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রাসাদটি দেখিয়া আমরা নীচে আহারের স্থানে গেলাম। ইংরাজ জাতির আহারের বন্দোবস্ত সব স্থানেই আছে; সভ্যেরা এখানে যাহা আহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই কিনিতে পারেন। আমরা এখানে 'কফি' পান করিয়া টেম্‌স্ নদীতীরস্থ মহাসভা গৃহের সুন্দর বারান্দায় বেড়াইতে গেলাম। গ্রীষ্মকালে অনেক সভ্য বন্ধুবান্ধবসহ এই স্থানে গল্প-স্বল্প ও আহারাদি করিয়া থাকেন। তখন এই বারান্দাটি সভ্যদের বন্ধু সমাগমে পূর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

যে পার্লামেণ্টের মন্ত্রণা দ্বারা পৃথিবীর অনেক স্থানের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যে পার্লামেণ্ট ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও সৌভাগ্যের কারণ, সেই পার্লামেণ্ট দেখিবার ইচ্ছা অনেক দিন হইতে ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

পরিশিষ্ট

জয়যাত্রা

অবলা বসু

ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করিতে পারি। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার কোনো গুণই আমার ছিল না, কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশসেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে কথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সেই বৎসরে আচার্য বসু মহাশয় অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্রিটিশ এসোসিয়েশনে আহূত হন। তাঁহার সহিত আমিও যাই; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ-যাত্রা। ইহার পর পাঁচ ছয়বার তাঁহার সহিত পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। আমার ভ্রমণকালের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস নানাভাবে ভাঙ্গিয়াছে ও গড়িয়াছে, এক আমার বয়সেই ইয়োরোপে কত পরিবর্তন দেখিলাম। এ দেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্তন কখনও দেখা যায় না।

বিলাতে পৌঁছিয়াই আচার্য লিভারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। বক্তৃতার দিন হলটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম। তাহার মধ্যে সার্ জে. জে. টমসন, অলিভার লজ ও লর্ড কেল্‌ভিন ছিলেন। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে সভয়ে উপরের গ্যালারিতে অন্যান্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে বসিলাম। এতকাল তো ভারতবাসী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবাদ বহুকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে, আজ বাঙ্গালী এই

প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের সম্মুখে যুঝিতে দণ্ডায়মান। ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কায় আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। তার পর যে কি হইল সে-সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ছবি আজ আর নাই। তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং জয়ই হইয়াছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আচার্যের আবিষ্ক্রিয়া-সম্বন্ধে বহুবিধ প্রশংসা করিলেন। জানিতে পারিলাম ইনিই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্লাসগোর ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। অলিভার লজ মহাশয়ও নানারূপে আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন। তাঁহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাজ করিতে অসমর্থ বলিয়া আচার্য তাঁহাদিগকে অসম্মতি জানাইলেন।

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানাস্থানে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলাম। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাক্তার গ্ল্যাডস্টোনের বাড়িতে এইরূপ নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া ভোজনসভাতে বসিয়া শুনিলাম, একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক— যাঁহাকে ভারতসচিব বিশেষজ্ঞ-রূপে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন— পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিতেছেন, "এই 'চন্দ্র বসু' লোকটি, যাহার কথা আজকাল লোকে এত বলিতেছে, সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে ছোট টেস্ট টিউব দিয়া পরীক্ষা করাইয়া তাহার স্থানে বড় টেস্ট টিউব দিলে আর তাহারা সেই পরীক্ষা করিতে পারেন না— ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্তু বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া হাতে-কলমে ব্যবহার তো কখনো করিতে পারে না!" পাশের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র‍্যাম্‌সে। তিনি বলিলেন, "চুপ করো— তুমি কিছুই জান না— ভারতবাসী বহুশতাব্দীর সাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে যে চিন্তাশীলতায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ্য যে ইহারা এ পর্য্যন্ত নিজের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করে নাই। যখন শিখিবে তখন ব্রিটেনের আধিপত্য চলিয়া যাইবে। তবে এই 'চন্দ্র বসু'

দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধিতে আমাদের ভয়ের কারণ নাই।"

ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনের শুক্রবাসরীয় বক্তৃতা দিবার জন্য আচার্য নিমন্ত্রিত হন। এইস্থানে বক্তৃতা দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন। তরল গ্যাসের (liquid gas) আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ Sir James Dewar তখন ইহার কর্তা ছিলেন। তিনি রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনেরই উপরের তলাতে বাস করিতেন। সেদিন আমাদের সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু সম্মানিত লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ, তাহার ফলে অনেকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। বঙ্গনারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বে আমার ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরাও সকলেই বুঝি খুব বিদুষী। এইসব নিমন্ত্রণে গিয়া সে ধারণা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল— তবে বৈজ্ঞানিকদের স্ত্রীরা যে খুবই পতিপ্রাণা ও পতির সেবাতে নিযুক্তা, ইহার সাক্ষ্য দিতে পারি। লর্ড কেল্‌ভিন নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধান ছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্বদাই তাহার সেবা করিতেন।

রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনের প্রবর্তক আদিগুরু ডেভি ও ফ্যারাডের যন্ত্রপাতি সেখানে সযত্নে রক্ষিত হয়। শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হয় এবং যদি সেখানে কেহ কোনো নূতন কিছু দেখাইতে চান তাহাও শুক্রবার দিন দেখানো হয়। আমরা আহারান্তে এইসব দেখিয়া বক্তৃতা-গৃহে গেলাম। সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম; যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙ্গালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে ৯টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘন্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা-অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লর্ড র‍্যালে বলিলেন,

'এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনো হয় নাই— দুএকটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব; এ যেন মায়াজাল।' আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম, আজকালকার মেয়েদের মতন চালাক-চতুর ছিলাম না, একটি কথাও বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়্যাল ইন্‌সটিটিউশনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতে আমাদের দেশে এরূপ কোনো স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতে আরম্ভ হইল।

১৩৩২ *বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ' প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।*

বানান মূলানুগ